মন্দ জানি না, সে আমার সহৃদয়তার মূল্য দেবে, নাকি তার সুযোগ নেবে, তা-ও জানি না— সেখানে তার প্রতি দরদ দেখানো বিপজ্জনক। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা অসৎ এবং সুযোগসন্ধানী— তাদের প্রতি মৈত্রী-মুদিতা-করুণা প্রদর্শন করাটা ঠিক, নাকি আইনের সাহায্যে তাদের শাসন করাটাই সমীচীন ?

ইদানীং কিছু কিছু নারীবাদী চেষ্টা করছেন 'কেয়ার' এবং 'জাস্টিস'-এর মেলবন্ধন ঘটাতে। এটা কতটা সম্ভব হবে জানি না। এটা নিশ্চিত যে দুই আর দুই-এ চার এর মতো কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটা করা সম্ভব হবে না। তার প্রধান কারণ হল যে 'কেয়ার-এথিক্স' আর 'জাস্টিস এথিক্স' দুটি ভিন্ন ঘরানার। জাস্টিস-বেসড এথিক্স-এর মূল কাঠামোটি 'মর্ডার্নিজম্'-এর দ্বারা প্রভাবিত। এ বইতে 'উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ'-এ যে বিতর্কের কথা বলা হয়েছে এথিক্সের অনুষঙ্গেও সেই তর্কের জের লক্ষ্য করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বলা যায় মূল স্রোতের নীতি-দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) এই নীতিশাস্ত্র ব্যক্তি প্রতিরূপের কথা না বলে যেন একটি জাতি প্রতিরূপের কথা বলে।

(২) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্র যেন সর্বদাই একটা প্রামাণিকভঙ্গি ধারণ করে, ভাবখানা যেন একটি অনন্য তন্ত্রের দ্বারাই নীতিশাস্ত্রের তাবৎ সমস্যার এককালীন উত্তর দেওয়া যাবে।

(৩) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্র একটা কৃত্রিম প্রাচীর তুলে নৈতিক আলোচনাকে সীমায়িত করে নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার মধ্যে, যার ফলে মানব অভিজ্ঞতার একটা বিরাট অংশ এই প্রাচীরের ওপারে থেকে যায়।

(৪) স্বরচিত সীমাবদ্ধতার দরুন মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের ধারণার পরিমণ্ডলটি একপেশে— এরমধ্যে নারীর অভিজ্ঞতার অনেকগুলি দিক স্থান করে নিতে পারে না।

(৫) নিরপেক্ষতাকে নৈতিকতার আবশ্যিক শর্ত মনে করা হয়।

(৬) এঁদের ঝোঁকটা সমরূপতার ওপর থাকার দরুন মনে করা হয় যে সব এক ধরণের দৃষ্টান্তের বিচার একই হওয়া উচিত।

(৭) ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৮) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের যুক্তির ছকটা অনেকটা গাণিতিক আদলে সাজানো হয়।

(৯) বহিরঙ্গের সম্পর্কের জগৎ আর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জগতের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমা টানা হয়। বহিরঙ্গের সম্পর্কগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পাবলিক মর‍্যালিটি এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে চর্চা করা হয় প্রাইভেট মর‍্যালিটিতে।

(১০) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রে নৈতিক সমস্যাগুলিকে আইনি সমস্যার ধাঁচে বুঝবার চেষ্টা করা হয়।

নারীবাদী নীতিশাস্ত্র মূলধারার এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার সমালোচনা করে থাকে। কেয়ার-এথিক্স-এর মতো অপরাপর নারীবাদী নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন মোতাবেক নৈতিক বিচার করে। নীতিশাস্ত্রের প্রেক্ষিতের এই পরিবর্তনটিকে অনেক সময় পার্সোনাল টার্ন বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ বলা হয় যে নীতিশাস্ত্রের অভিমুখ জাতি-প্রতিরূপ থেকে ঘুরে ব্যক্তি-প্রতিরূপের দিকে মোড় নিয়েছে।

মূলস্রোতের প্রতি তুলনায় নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) নারীবাদী নীতিশাস্ত্র কখনোই প্রামাণিকতা দাবি করে না। তাদের বক্তব্যের পুনর্বিচারের জন্য তারা সবসময় প্রস্তুত।

(২) একই সমস্যাকে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। প্রান্তিক সমাজের নৈতিক বিচারধারাও যে অনুধাবনযোগ্য তা মনে রাখতে হবে।

(৩) মনে রাখতে হবে আমরা কেউই নিরপেক্ষ নই, প্রত্যেকেরই কোনো-না কোনো পক্ষপাত আছে। প্রত্যেকের পক্ষপাত বিষয়ে মূল্যায়ন ও সমালোচনার সুযোগ যেন থাকে তা দেখতে হবে।

(৪) সমরূপতা খোঁজার চেষ্টা না-করে প্রতিটি সমস্যার অনুপুঙ্খের দিকে নজর দিতে হবে।

(৫) প্রত্যেকের বিশেষ চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিতে হলে আমাদের 'শ্রবণের' দক্ষতা বাড়াতে হবে যাতে আমরা বিভিন্ন 'স্বর' শুনে তাদের বক্তব্য বুঝতে পারি। এ যাবৎ দর্শনের অঙ্গনে যাদের অপাংক্তেয় বলে মনে

করা হয়েছে তাদেরও কথা শুনতে হবে।

(৬) নারীবাদী নৈতিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর না দিয়ে অসাম্য দূর করায় অধিক আগ্রহী।

(৭) এমন একটা ভাষায় কথা বলতে হবে যা সহজবোধ্য এবং যা অশিক্ষিত মহিলারাও বুঝতে পারেন। কারণ মনে করা হয় যে নৈতিক জীবনযাপনের রূপরেখা একমাত্র যৌথভাবেই রচনা করা যায়।

(৮) নারীবাদী নৈতিকতায় ইমোশন বা আবেগের একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

(৯) আবেগাশ্রিত সিদ্ধান্ত কখনোই মূল্যায়ন বা সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়।

(১০) নারীবাদী নৈতিকতা অনুজ্ঞাধর্মী নয়, তার ঝোঁকটা হল সকলকে নিয়ে চলার চেষ্টা করা।

মূলস্রোতের নৈতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে নারীবাদী নৈতিকতার তুলনা করলে বোঝা যায় দু'য়ের মধ্যে কত পার্থক্য। তাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গে এই পার্থক্য যতটা স্পষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক বেশি তা স্পষ্ট হয় ফলিত নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে। নারীনিসর্গ-নীতিবাদ ফলিত নীতিশাস্ত্রের এমনই একটি শাখা। লিবারাল ও র‍্যাডিক্যালভেদে নিসর্গ নীতি নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থান নেবার প্রচলন আছে। লিবারালরা মনে করেন নিসর্গনীতিকে কোনো প্রকারে মূল স্রোতের নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, আর র‍্যাডিক্যালরা মনে করেন যে নিসর্গনীতির সমস্যা এমনই অনন্য যে তার প্রয়োজনে নীতিশাস্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

❖ নারী-নিসর্গনীতি (Women Ecology) :

'নিসর্গনীতি' (Ecology) আধুনিককালে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে এই শাস্ত্র।

নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার দিকে নারীবাদী নারী ও পুরুষের সম্পর্কের নানা বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে প্রশ্নের জাল ছড়াতে লাগল। নারীমুক্তির প্রশ্নটি তখন জড়িয়ে গেল আরো অনেক জটিল সম্পর্কের অনুষঙ্গে। প্রশ্ন উঠল নারী ও নিসর্গের অবস্থান বিষয়ে।

একদল নারীবাদী মনে করলেন নিসর্গনীতি আর নারীবাদের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে একটি গভীর যোগসূত্র। তাঁরা মনে করেন পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে। ফলে, বর্তমানে মানুষ ও নিসর্গের সম্পর্কের মধ্যে যে অনৈতিক রূপ দেখতে পাই তার মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে অবদমনের সম্পর্ক, আর তারও মূলে রয়েছে পুরুষতন্ত্র। এইভাবে নিসর্গের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীমুক্তির সমস্যা—দ্বিতীয়টা বাদ দিয়ে প্রথম সমস্যার সমাধান হতে পারে না। নারীমুক্তির আন্দোলনের এই স্বর শোনা যাচ্ছে নারী-নিসর্গনীতিবাদী বা 'ইকোফেমিনিস্ট'দের কাছ থেকে। 'ইকোফেমিনিজম্' (ecofeminism) পদটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রাঁসোয়া দা ওবোঁন্ (Francoise de Eaubonne) তাঁর 'লে ফেমিনিজম্ উ লা মো' (*Le Feminism ou La Mort, 1984*) বইটিতে। ঠিক যেমন নারীবাদের অনেক রূপ আছে তেমনই নারী-নিসর্গনীতিরও অনেক রূপ আছে। সব নারীবাদীরা নারী নিসর্গনীতি সমর্থন করেন না।

পশ্চিমের কল্যাণে আমরা নিসর্গনীতির অনেক রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ইকোলজির সমস্যাকে কেউ দেখেন নৈতিক সমস্যারূপে, কেউ দেখেন রাজনৈতিক সমস্যার আদলে, কেউ চান তাত্ত্বিক আলোচনা আর কেউ বা চান সোজাসুজি কোনো ক্রিয়াকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আমরা জেনেছি 'ইকোলজি' বলতে কোনো একটা 'বাদ' বা 'তন্ত্র' বোঝায় না। যাঁরা মানুষ ও নিসর্গের সমস্যাকে একটি রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্যা হিসেবে দেখেন তাঁদের জিজ্ঞাসাকে 'নিসর্গ-রাজনীতি জিজ্ঞাসা' বা 'ইকো-পলিটিক্স' বলা হয়।

নিসর্গ-রাজনীতি যাঁরা করেন তাদের মধ্যে একটি অন্তর-বিসম্বাদ বেশ কিছুদিন যাবৎ দানা বেঁধে উঠছে। এই বিবাদকে অনেক সময় 'ইন্টারনাল গ্রীন ডিবেট' বলা হয়। এই বিবাদের তিন শরিক—'সোশাল ইকোলজিস্ট' বা সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদী, 'ডিপ-ইকোলজিস্ট' বা নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদী এবং 'ইকোফেমিনিস্ট' বা নারী-নিসর্গবাদী। শেষোক্ত মতবাদীরা অভিযোগ করেন যে অপর দুই শরিকের মতবাদের মূলে পুরুষতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত

কাজ করে চলেছে। এই আপত্তি কেন করা হচ্ছে বুঝতে গেলে জানা প্রয়োজন পুরুষতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত বলতে সাধারণভাবে এঁরা কী বোঝেন, তারপর ধরার চেষ্টা করতে হবে নিসর্গবাদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে কেমন করে। এই প্রেক্ষাপট বুঝলেই পরিস্ফুট হয় নারী নিসর্গনীতির জেহাদ কিসের বিরুদ্ধে।

কোনো বিশেষ পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি আর পুরুষতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু এক নাও হতে পারে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিবিধ ও বৈচিত্র্যময়। কিন্তু 'পুরুষতন্ত্র' বলতে একটি সমরূপ তন্ত্র বা সিস্টেম বোঝায়। এই তন্ত্রের প্রেক্ষিতে একটি আদর্শ পুরুষের প্রতিরূপ নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণে পুরুষ যে যে গুণসমন্বিত, স্ত্রী-প্রতিরূপ ঠিক সেই সেই গুণের বিপরীত গুণে গুণান্বিত। সব পুরুষতন্ত্রেই এই মত প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক লেখাতেই এই বৈপরীত্যের উল্লেখ করেছেন। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী'-তে তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে লিখছেন— 'নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। যে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোশষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে'।

স্বভাবের বৈপরীত্য স্বীকার পুরুষতন্ত্রের গোড়ার কথা। স্ত্রী-সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য তার প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালনের ক্ষমতা, তার প্রেম, তার মমতা, তার সংবেগ; এই সবই নারীবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—মনন ও চিত্তের সঙ্গে নয়। প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন, প্রাণতোষণ, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগতেরও মুখ্য কাজ এই যুক্তিতে পুরুষতন্ত্রে স্ত্রীজাতিকে প্রকৃতির কোটিতে রাখে আর পুরুষকে দেয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের সাধনার দায়িত্ব'। রবীন্দ্রনাথ এ-ও বলেন যে পুরুষ এই বিশ্লিষ্ট ক্ষমতাবলে 'প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি' (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি')।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে সব 'তত্ত্বের' জনক পুরুষ প্রজাতি, তারাই আবার সংস্কৃতি বা কালচারেরও প্রবর্তক। তারা তাদের মতো করে স্ত্রী-স্বভাবকে বুঝেছে, আর বুঝেছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে। এই পুরুষকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে সমাজের প্রেক্ষাপটে বা নিসর্গের প্রেক্ষাপটে স্ত্রী-পুরুষের আদর্শ অবস্থান কী হওয়া বাঞ্ছনীয় তাও নির্দিষ্ট হয়েছে পুরুষের মনন ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে। পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে-তত্ত্ব বা থিওরি গড়ে ওঠে তাই একমাত্র বৈধ মত। এ-ও দাবি করা হয় যে, এটাই যৌক্তিক মত, এবং যৌক্তিক মত মাত্রই লিঙ্গরহিত, ফলে এটা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য।

শুধু যে এই একঝোঁকা সভ্যতা মেয়েদের অভিজ্ঞতারহিত তা নয়, পুরুষতন্ত্র বলে এমনটি হওয়া কাম্য। কারণ সংবেগ ও যুক্তি দুই ভিন্নমুখী বৃত্তি। সংবেগের যোগ আছে হৃদয়ের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে—তার পালিকাশক্তি অনস্বীকার্য। সংবেগকে যুক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখাই শ্রেয়। মানুষ মননশীল জীব। ফলে, তার মনন ও যুক্তির নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন করাই মঙ্গল, সংবেগকে মানবজীবনের চালিকাশক্তির আসন দেওয়া বিপজ্জনক। মনে করা হয় যে যুক্তিরহিত সংবেগ মানুষকে নিয়ে যায় পশুর কাছাকাছি, প্রকৃতির কাছাকাছি।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন পুরুষ থেকে পৃথক করে প্রকৃতির কোটিতে নারীকে স্থান দেওয়ার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে পুরুষতন্ত্রের একটি সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি। পুরুষ ও নারী স্বভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাদের সামাজিক দায়ও একেবারেই পৃথক, এই চিন্তাটাই পুরষতন্ত্রের ফসল। প্রথমে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর খাড়া করা হয়, তারপর, এক পক্ষকে দেওয়া হয় শক্তির আসন ও অপর পক্ষকে দেওয়া হয় সমর্পণের দায়। কোনো নারী যদি শক্তির পরিচয় দেন তিনি বিবেচিত হন 'পুরুষালি-স্ত্রীলোক' হিসেবে আর কোনো পুরুষ যদি সমর্পণের ভূমিকা পালন করেন তিনি হবেন 'মেয়েলি-পুরুষ'।

মনে হতে পারে ভূমিকা ভাগ করায় ক্ষতি কী ? পরস্পরকে অসম্মান না-করলেই হল। রবীন্দ্রনাথের কথা মেনে নিয়ে যদি বলি যে, 'মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে দাবি করে যে,

তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলে মেয়ের সেবা তারা করিবে'। তাদের কাজ ভালবাসার কাজ, এটাই তাদের আদর্শ। (স্ত্রী-শিক্ষা)। নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের পুরুষতন্ত্রের কাছে প্রশ্ন 'নারীর এই কথিত প্রবণতার উৎস কী ?' যুক্তি তথা শক্তিতে অধিকার নেই বলেই কি তাদের 'প্রাণতোষণের' বিকল্প বেছে নিতে হয়নি ? পুরুষকে বলা হল 'প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে'। অর্থাৎ ক্ষমতাবান পুরুষ পথচ্যুত হলে নারীই পারবে তাকে ধর্মের পথে, তার প্রকৃতিগত স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে। নারীর এই আদর্শময়ী রূপ টিকিয়ে রাখার জন্যই কি তাকে ক্ষমতার লড়াইয়ের ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হল ? ক্ষমতা পেলে নারী কলুষিত হয় তাই কি তাকে পুরুষতন্ত্র পালনের দায়িত্ব দিল—সভ্যতা সৃষ্টির নয় ?

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীবাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি হল পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে স্ত্রীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই গোষ্ঠী মনে করেন পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে মননের যোগ সুপ্রতিষ্ঠিত, ফলে প্রথমেই মননের প্রাধান্য অস্বীকার করে সংবেগকে চালিকাশক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মুক্তি। তবেই স্ত্রীশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, নগরসভ্যতার অবসান হবে, আমরা ফিরে যাব কাল্পনিক কোনো সংবেগময় আদিযুগে। এই পথে মুক্তির বিপদ একটাই—যে সভ্যতা ঝুঁকেছিল পুরুষের দিকে পাল্লা ভারি করে, সেটা এবার ঝুঁকবে স্ত্রীর দিকে পাল্লা বোঝাই করে। সেই একঝোঁকা সভ্যতাই থেকে যাবে—ঝোঁকটা বদল হবে এই যা।

কেউ বলতে পারে কোনো একদিকে সভ্যতার ভারি হাওয়ায় দোষ নেই, দেখতে হবে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে কোনটা বেশি মানবিক, বা কোনটা মানুষের জন্য কম অকল্যাণকর। কিছু নারীবাদী দাবি করেন পুরুষতন্ত্র ভর করে আছে একনায়কত্বের ওপর, তার নীতি দমন, শোষণ ও পীড়নের, তার হাতিয়ার যুদ্ধ। পরিবর্তে স্ত্রীতন্ত্র এলে লালন, পালন, সেবা, মাধুর্য, প্রেম, ভালবাসার মন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হবে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা এই মত সমর্থন করেন না। পুরুষ ও নারীর এই দ্বি-কোটিক অবস্থানেই তাঁদের আপত্তি।

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীবাদের অপর একটি বহুলসমর্থিত প্রকল্প হল অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প। এই মতানুসারে নারী-পুরুষের পটুত্বের ক্ষেত্র-বিভাজন অনিষ্টকারী ও অনভিপ্রেত। কে বলে কলায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মে, রিধিব্যবস্থা মিলিয়ে যাকে সভ্যতা বলে তা পুরুষেরাই পারে সৃষ্টি করতে ? সুযোগ ও অধিকার পেলে মেয়েরাও পারে এই কর্মকাণ্ডে সামিল হতে। নারীমুক্তি মানে প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের সৃজনহীন জৈবিক বৃদ্ধি থেকে মুক্তি পাবার অধিকার। এখানে মুক্তির লড়াই অন্তর্ভুক্তির লড়াই মানে পুরুষের তন্ত্রে নারীর দীক্ষা। যদি শারীরিক বা মানসিক কারণে এই 'উত্তরণে' কোথাও বাধা পড়ে তাহলে সেখানে শিক্ষা, অনুশীলন এমনকী আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এরজন্য প্রয়োজন হলে শারীরবৃত্তিকে গৌণ করে মননকে মুখ্য করার অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে, মেয়েমানুষকে আরো বেশি মানুষ করে তুলতে হবে, তাকে সাহায্য করতে হবে তার জৈবিক স্বভাব কাটিয়ে ওঠার সাধনায়। প্রয়োজন হলে জৈবিক স্বভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের এই প্রকল্পে প্রবল আপত্তি। তাঁরা মনে করেন এর ফলে পুরুষতন্ত্রের সব দোষ ও দুর্বলতা মেনে নিয়ে এতদিনের লালিত স্ত্রীসুলভ গুণগুলিকে অবদমন করতে হবে বা সরিয়ে রাখতে হবে। এই যদি পুরুষতন্ত্রে প্রবেশের শর্ত হয় তবে তা নিতান্ত অবমাননাকর। শুধু তাই নয়, বৃহত্তর মানবসভ্যতা তথা নিসর্গের পক্ষেও এই ব্যবস্থা মঙ্গলজনক নয়। তাঁদের এই আপত্তি খুব স্পষ্টরূপ নেয় যখন তাঁরা 'সোশ্যাল-ইকোলজি' বা সামাজিক-নিসর্গনীতির সমালোচনা করেন। তাঁরা মনে করেন এই মতটি পুরুষতন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রতিবিম্ব।

সামাজিক নিসর্গনীতির মূল কথাটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। এই মতের অন্যতম বক্তা মারে বুক্‌চিন, যাঁর বিখ্যাত বই 'রিমেকিং সোসাইটি : দ্য ফিলজফি অব সোশাল ইকোলজি' (১৯৮৯)। তাঁর মতে মানুষ আজ নিঃসন্দেহে পরিবেশকে দূষিত করে, অন্যান্য জীবের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে, উদ্ভিদজগৎকে যথেচ্ছভাবে নির্মূল করে বা তার স্বাভাবিক বাড় হতে দেয় না। এককথায় নিসর্গ নিপীড়ন বা 'ডমিনেশন অব নেচার' আজ ব্যাপক আকার নিয়েছে। সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এই বৈরীভাবের উৎস মানবসমাজেই রয়েছে। মানবসমাজে মানুষ একে অপরকে দমন করে, পীড়ন করে, অবহেলা করে। এই

অত্যাচার মানবসমাজে সীমাবদ্ধ থাকে না, নিসর্গের প্রতিও প্রসারিত হয়।

মানুষের রয়েছে যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা বা 'রিজন'। এই ক্ষমতা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—সে ছেড়ে আসতে পেরেছে তার আদিম জৈবিক স্বভাবকে। এখন মানুষ পারে তার নিজের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সে পারে সৃষ্টি করতে নতুন সত্ত্বা। মানুষ আত্মসচেতনতা তাকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক করে। বুকচিনের বিখ্যাত উক্তি 'হিউম্যানস্ আর নেচার রেন্ডার্ড সেলফ্-কনশাস'। ফলে, নেচার বা প্রকৃতির দুটো পরিচয় আমরা পাই—তার আদি পরিচয় বা প্রকৃতির আত্মসচেতনতাবিহীন পরিচয়, আর তার রূপান্তরিত পরিচয় যা প্রকৃতির আত্মসচেতনতাযুক্ত পরিচয়। প্রেক্ষাপটে মানুষ আসার আগের রূপকে যদি বলি 'আদিপ্রকৃতি' তাহলে বলা যায় এই আদিপ্রকৃতির রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিল মানুষ—যে স্বরূপতা যৌক্তিক বা 'র‍্যাশনাল'।

রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন— 'পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে....।' ("শেষ কথা", 'তিনসঙ্গী')।

তাহলে বলা যায় এই দুই প্রকৃতির সম্বন্ধে হবে বি-সম। বি-সম, কারণ আদিপ্রকৃতির নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই, অথচ রূপান্তরিত প্রকৃতি স্বরূপত 'স্ব-নিয়ামক', কারণ তা যৌক্তিক। আদিপ্রকৃতি ও রূপান্তরিত প্রকৃতির এই ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য কোনোদিনই আদিপ্রকৃতি তার নিজের স্বার্থে নিজের মতো করে তার অধিকারের বোঝাপড়া করে নিতে পারবে না—যেহেতু তার অধিকার নেই।

বুকচিন মনে করেন শোষণের নানা স্তর ভেদ আছে। সামাজিক স্তরে মানুষ শোষণ করে মানুষকে, আর এই শোষণের অপর একটি স্তরে মানুষ শোষণ করে প্রকৃতিকে। শোষণের ব্যাপকতর স্তরই হল অন্তর্বর্তী স্তরে শোষণের হেতু। নিসর্গের ওপর মানুষের অনৈতিক শোষণ দূর করতে হলে আগে সামাজিক স্তরে তা দূর করতে হবে। বুকচিন মনে করেন নৈতিক বা রাজনৈতিক বিচার মানবসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নিসর্গপ্রকৃতির যেহেতু যুক্তি-ব্যবহারের ক্ষমতা নেই সেহেতু সে কখনোই নৈতিক বা রাজনৈতিক বিধান জোগাতে পারে না, যদিও সে নৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার হতে পারে। যুক্তি-ব্যবহারে মানুষের রয়েছে একচেটিয়া ক্ষমতা, এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। এই ক্ষমতার বলেই নিসর্গের প্রতি তার দায়বদ্ধতা বর্তায়।

এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে যুক্তিবাদী জীব হিসেবে প্রথমে তাকে দূর করতে হবে সামাজিক অসাম্য, দূর করতে হবে মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ। এর জন্য চাই যুক্তি-নির্ভর সমাজ। আবেগ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা—সবেরই মূলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যুক্তির নিয়ামক শক্তিকে; তবেই গড়ে উঠবে সত্যিকারের একটি যৌক্তিক কালচার বা সংস্কৃতি। বুকচিনের সামাজিক-নিসর্গনীতি মূলতঃ 'হিউম্যানিস্ট এনলাইটেনমেন্ট' বা মানবিক জ্ঞানালোকবাদের অনুগামী। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এই মতের সঙ্গে মরমী চেতনা বা মিস্টিসিজম বা অধ্যাত্মবাদ কোনোটাই খাপ খায় না। বুকচিনের মতে মানুষ যে শুধু যুক্তিবাদী জীব তাই নয়, তার এই পরিচয় তাকে করে তোলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যুক্তির অধিকারী বলে সমগ্র নিসর্গ প্রকৃতি পরিচালনার দায়িত্ব স্বীকার করেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদীরা অযথা মানুষের যৌক্তিক স্বরূপের সঙ্গে তার ক্ষমতাশালী হওয়ার একটা আবশ্যিক সম্পর্ক দেখতে পান। যুক্তির নিরিখে সব কিছুকে পরিচালনা করার তাঁদের এই চেষ্টার মধ্যে যেন কাজ করে যাচ্ছে এক ধরণের যুক্তির সাম্রাজ্যবাদ।

নারী-নিসর্গবাদীরা বুকচিনের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ আর প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্বের ভাব পোশণের মধ্যে যোগ অবশ্যই আছে। তবে তাঁরা মনে করেন না যে এই ব্যবহারের মূলে আছে বিচার-বুদ্ধির অভাব। তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে মানুষের যৌক্তিক প্রেক্ষিত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সমদর্শী হয়ে উঠবে। বরঞ্চ নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা অভিযোগ করেন যে মানুষ খুব সুচিন্তিতভাবে যুক্তিকে কাজে লাগিয়েই (যুক্তির দোহাই দিয়ে) মানুষকে ও প্রকৃতিকে পীড়ন করে চলে। যুক্তির চালিকাশক্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন না বলে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদের ওপরও

ভরসা করেন না। পিতৃতন্ত্রই মানুষের দমনমূলক, বিভেদমূলক আচরণের জনক।

আমরা বলেছি 'ইন্টারনাল গ্রীন ডিবেট'-এর তিন শরিক। তাদের মধ্যে সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদের কথা কিছুটা জানা গেল, এবার বিচার করা যাক 'ডিপ-ইকোলজি' বা নিবিড়-নিসর্গনীতির বক্তব্যটিকে। 'ডিপ-ইকোলজি' পদটি প্রথম ব্যবহার হয় নরওয়েজিয়ান দার্শনিক আরনে নেস্-এর "দ্য শ্যালো অ্যান্ড দ্য ডিপ, রঙ রেঞ্জ ইকোলজি মুভমেন্ট" প্রবন্ধে ১৯৭৩-এ। এই মতবাদ সামাজিক নিসর্গনীতিবাদের ঘোর বিরোধী। নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করিয়ে দেন যে মানুষের যেমন স্বকীয় মূল্য আছে তেমনই অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদেরও স্বকীয় মূল্য আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ স্বতই মূল্যবান—একটি গাছ বা পাথরের মূল্য মানুষের নিরিখে স্থির হয় না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য স্বীকার করাটা নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদের গোড়ার কথা।

গভীর-নিসর্গনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্যটি মেনে নিয়ে নানা ধরণের মতবাদ গড়ে উঠেছে। পিটার সিঙ্গারের রচনায় আমরা এক ধরণের নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদের সমর্থন পাই। তিনি মনে করেন না যে নৈতিক অধিকার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁর মতে প্রকৃতিরও নানা অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি আরোপিতও নয়, পরাশ্রয়ীও নয়। যেমন গাছ, ফুল, পাখি সবেরই অধিকার আছে টিকে থাকার, বিকশিত হওয়ার। নিবিড়-নিসর্গনীতির সব সমর্থকরা স্বীকার করেন যে মানবকেন্দ্রিকতা দুষ্য। এই অংশে নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের কাছে নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদ প্রশংসনীয়।

সিঙ্গারের মতো দার্শনিকরা যখন মানবকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নিসর্গপ্রকৃতির স্বকীয় মূল্য স্বীকারের কথা বলেন তখন তাঁরা পুরুষতন্ত্র থেকে সরে আসার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। এঁরা নতুন করে মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক ঢেলে সাজানোর সময় পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত সঙ্কট সম্বন্ধে অনবহিত থেকেই যান। এর ফলে তাঁরা জড়িয়ে পড়েন একটা প্যারাডক্স বা কূটাভাসে। একদিকে তাঁরা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাইছেন আর অপরদিকে পিতৃতন্ত্রের চিন্তাকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রয়ে যাচ্ছেন। মানুষের সমাজকে তাঁরা ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছেন না, অথচ প্রকৃতিকে স্বাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করছেন—এইভাবে সৃষ্টি হচ্ছে একটা দ্বান্দ্বিক অবস্থা।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা ধারণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ই ধারণাটি জড়িয়ে আছে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিচারের সঙ্গে। পিতৃতন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা মনে করেন তিটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর। সম্পূর্ণ মানসিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে না পারলে কারোর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না—তা সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক। এই ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুসারে পুরুষ বা নারী যতক্ষণ অপরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেয় ততক্ষণই বলা যায় তার শৈশব কাটেনি—সে প্রাপ্তবয়স্ক জীবন যাপন করছে না।

এমন স্বনির্ভর হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুশীলনের গোড়ায় গলদ আছে বলে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন। তাঁরা বলেন, পুরুষ বা নারী কেউই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারে না। পরস্পরের ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে আমাদের ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও আছে পুরুষদের মধ্যে নারীসুলভ গুণ, যদিও পুরুষতন্ত্র তা অস্বীকার করতে বা খাটো করতে শেখায়। তাদের মতে মেয়ের পুরুষালি গুণ বা পুরুষের মেয়েলি গুণ থাকার অর্থ প্রাপ্তবয়স্কসুলভ ব্যক্তিত্বের অভাব। পুরুষতন্ত্র শুধু যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার পরামর্শ দেয় তা নয়, মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি এটাই বলা হয় পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যতটা ভেদ আছে নারী ও প্রকৃতির ভেদ ততটা নয়—যেহেতু নারী ও প্রকৃতির উভয়ের রয়েছে পালিকা-শক্তি, জীবনদায়িনী শক্তি এবং এ জাতীয় আরো নানা সাদৃশ্য। এমন স্বনির্ভর হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের গোড়ায় গলদ আছে বলে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন—পুরুষ বা নারী কেউই সম্পূর্ণত আত্মনির্ভর হতে পারে না। পরস্পরের ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে আমাদের ব্যক্তিত্ব।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা বিভাজন স্বীকার করেন, কিন্তু বিভেদ স্বীকার করেন না। ফলে, পুরুষ/স্ত্রী, মানুষ/প্রকৃতি, সংস্কৃতি/প্রকৃতি এই বিভাজনগুলি মেনে নিয়েও তাঁরা বলবেন না যে এই জুটিগুলির প্রথম পদটি

সর্বদাই তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় পদটির চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাঁরা জোরের সঙ্গে এও বলেন যে একটি জুটির কোনো পক্ষ দুর্বল হলে অপরপক্ষের তাকে শাসন বা পরিচালনার অধিকার জন্মায় না, ঠিক যেমন পার্থক্য থাকলেই তা থেকে একপক্ষকে উৎকৃষ্ট ও অপরপক্ষকে নিকৃষ্ট বলা সঙ্গত নয়, যদিও আমাদের এইভাবেই চিন্তা করতে শেখানো হয়। একটা বিভাজন করা মাত্রই উভয় বিভাজ্য পদে পৃথক পৃথক মূল্য আরোপ করতে শেখায় পিতৃতন্ত্র।

'ডিপ ইকোলজি' বা নিবিড়-নিসর্গনীতির সঙ্গে নারী-নিসর্গনীতির বিতর্ক কখনোও কখনোও খুব সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে। যে নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদীরা পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা না করে কেবলমাত্র প্রকৃতির বাড়তি অধিকার মেনে নেবার মধ্যে তাঁদের কর্মসূচিকে সীমাবদ্ধ রাখেন তাঁদের সঙ্গে নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের পার্থক্যটা স্থূল। কিন্তু আর এক দল নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদী আছেন যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থক্য সবই অস্বীকার করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁদের শ্লোগান হল 'নেচার ফার্স্ট' (nature first)—প্রকৃতির দাবি আগে। মানুষকে সবরকম আসক্তি ত্যাগ করে, আত্মশ্লাঘা ত্যাগে ব্রতী হয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এই একাত্মতার জন্য চাই মানসিক স্তরে পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক উত্তরণ ছাড়া এটা ঘটানো সম্ভব নয়। ফলে নিবিড়-নিসর্গবাদের প্রকল্প হয়ে দাঁড়ায় নৈতিক, রাজনৈতিক নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা যাবে না যে তাঁরা যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন যে নিসর্গনীতির সমস্যাটি মূলত 'ইকোজাস্টিস' বা 'নিসর্গ-ন্যায়' সম্পর্কিত প্রশ্ন, যার সমাধান একমাত্র রাজনৈতিক উপায়েই হতে পারে। এর ফলে একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নতুন করে সাজাতে হবে আর অন্যদিকে সংস্কৃতির মধ্যে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের নববিন্যাস ঘটাতে হবে। ইকোজাস্টিস-এর ভাগ-বন্টনে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় দাবিহীন শরিক যেমন নয় তেমনই সংস্কৃতি নির্মানের ক্ষেত্রটিও একচেটিয়া পুরুষের নয়—এই নির্মাণে স্ত্রীরও ভূমিকা আছে। এমন ভাবলে ভুল হবে যে স্ত্রী, পুরুষ ও প্রকৃতি তিনেরই স্বতন্ত্র অধিকারের এলাকা আছে এবং ইকোজাস্টিস-এর দায়িত্ব হল এই তিনের মধ্যে অধিকারের নৈতিক বণ্টন ঘটানো বা নৈতিক দায়দায়িত্ব বণ্টন করা। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন এই বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাগীদারের দায়দায়িত্ব কোথাও স্বতন্ত্র, কোথাও স্বতন্ত্র নয়, কখনো এককভাবে দায়িত্বপালন করতে হয়, কখনো আবার যৌথভাবে দায়িত্ব পালনের দায় বর্তায়। এই নির্ভরশীলতা ও স্বনির্ভরতার সীমানা বদল হতে থাকে। কোনো এককালে দাঁড়িয়ে সর্বকালের জন্য অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনের বিধিব্যবস্থা করা যায় না।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা তাঁদের বক্তব্য বোঝানোর জন্য তালি দেওয়া কাঁথার রূপক ব্যবহার করে থাকেন। কাঁথার প্রতিটি তালির নিজস্ব জীবনেতিহাস আছে—এখানে তারা স্বতন্ত্র। তালিগুলি একই কাঁথায় গাঁথা থাকে বলে কাঁথাটির একটি সমগ্ররূপ তৈরি হয়, এখানে তালিগুলি সমন্বিত। সে রূপের মধ্যে বৈচিত্র্যগুলি বিধৃত হয়ে থাকে। অথচ এই তালিগুলির কোনো আবশ্যিক 'সামান্যলক্ষণ' নেই। এই রূপকের সাহায্যে আমাদের নিসর্গ-নীতির সমস্যা বুঝতে হবে। বিচিত্র গুণের বিচিত্র মানের সদস্য যখন জড়াজড়ি করে বাঁচতে চায়, অর্থাৎ কেউই তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে চায় না, তখন একটা একরৈখিক সমাধান দিয়ে তাদের সমস্যা দূর করা যায় না—সমস্যার সরলীকরণ হয় মাত্র। এতদিন যাবৎ পিতৃতন্ত্র সরলীকরণের পন্থা অবলম্বন করে চলেছে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন যে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ যদি তাঁরা তুলে ধরতে পারেন তা হলে তা হবে একটা বড় মাপের কাজ যা ভবিষ্যৎ কর্মীদের নির্দেশ যোগাবে।

তাঁরা এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে চান শান্তির রাজনীতির মাধ্যমে। তার জন্য তাঁরা কিছু কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন। যে মতবাদ মানব-অতিরিক্ত 'নন-হিউম্যান' পরিবেশকে অযথা দমন করে বা কষ্ট দেয় নারী-নিসর্গনীতি সে মতের বিরোধী। সেইসঙ্গে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা পিতৃতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন অবদমনের মুখোশ খোলার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যান।

পিতৃতন্ত্রের একটা বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—বলার চেষ্টা করা হয় যে, যে ভুক্তভোগী তার

অসুবিধে সে নিজে যতটা ভাল বোঝে বাইরের লোকে তা তার চেয়ে ঢের ভাল বোঝে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন সকলকে তাদের নিজের মতো করে সুখ-দুঃখের উপলব্ধি ব্যক্ত করতে দেওয়া উচিত। তত্ত্বের অনুষঙ্গে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা বহু তত্ত্ববাদী। একই সমস্যার বহু ব্যাখ্যা সম্ভব, বহুবিধ সমাধানও সম্ভব। আমরা একইসঙ্গে বিবিধ তত্ত্ব নিয়ে কাজ চালাতে পারি এবং চালানো উচিতও। শেষ উত্তর দেবার অধিকার কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেই। এই কারণেই তাঁদের মতে কোনো তত্ত্বই ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয়, সব তত্ত্বই প্রেক্ষাপট নির্ভর। নারী-নিসর্গনীতিবাদের গোড়ার কথা এই যে তাঁরা মনে করেন মানুষ আবশ্যিকভাবে একে অপরের সঙ্গে ও নিসর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত— এই সম্পর্ক আপতিক নয়— এই সম্পর্কগুলি সামাজিক নির্মাণের ফসল। সমাজকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই— সমাজকে বদল করা যায় মাত্র। একমাত্র দরদ থাকলেই আমরা প্রভেদ সত্ত্বেও বি-সম আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারি, ক্ষমতার তারতম্য আছে জেনেও দুর্বলকে পীড়ন করা থেকে ক্ষান্ত হতে পারি।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা যেসব নৈতিক গুণ সমর্থন করেন তারমধ্যে রয়েছে দরদ বা 'কেয়ার', মৈত্রী, আস্থা, ভালবাসা, দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা। এই আচরণ অনুশীলনের প্রসঙ্গ উঠছে কারণ এই মতে মানুষের নৈতিক গুণ তথা ব্যক্তিত্ব সর্বদাই সৃজিত, জন্মায়ত্ত নয়। নারী-নিসর্গনীতিবাদ ভবিষ্যৎ সমাজের নৈতিক চিন্তাধারার একটা প্রকল্প মাত্র। এঁদের কাছ থেকে 'ইকোজাস্টিস'-এর নির্দিষ্ট বিধি কী হবে তার কোনো তালিকা পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা হল নৈতিক বিধির কতকগুলি নির্দেশিকা যার থেকে বিশেষ বিধি প্রয়োজনমতো নির্মাণ করা যায়।

এঁদের প্রাথমিক কর্মসূচি প্রধানত দুটি—

এক, প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে অপরাপর ব্যক্তি ও নিসর্গের সঙ্গে নানা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে তা স্বীকার করা। ব্যক্তি কখনোই একটা আণবিক তন্মাত্র নয়। এই চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনে কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়েছে—বিশেষ করে যেখানে মানুষের বিভিন্ন জন্মগত ঋণের কথা বলা হয়েছে। মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, সবই পৃথক পৃথক সত্ত্বা নিয়ে আসে— তারপর কোনো এক পদ্ধতিতে তাদের একত্রে রাখা হয়— এমনটি নয়। মনে করতে হবে এরা সবাই গোড়া থেকেই পরস্পরনির্ভর।

দুই, যে কথাটা বলা হচ্ছে, তা হল গবেষণার পদ্ধতি বা মেথডলজি বিষয়ে। নারী-নিসর্গবাদীরা একযোগে বহু পদ্ধতি স্বীকার ও প্রয়োগে বিশ্বাসী, তাই এ মতটিকে বলা যায় 'মেথডলজিক্যাল প্লুরালিজম্' বা 'বহুপদ্ধতিবাদ'। কোনো একটি মেথডকে প্রাধান্য দিলে জ্ঞানের চাবিকাঠির মালিকানা তাকেই দেওয়া হয়। বহুপদ্ধতিবাদ এই প্রচলনের বিরোধী।

এ দুটি শর্ত মেনে নিলে— অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি সৃষ্টির প্রথমক্ষণ থেকে নানা আবশ্যিক সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং বহুজনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, বোধ দিয়ে, ব্যাখ্যা দিয়ে, জ্ঞানের নকশি কাঁথা সৃজিত হয়— মানুষের রাজনীতির উদ্দেশ্য বদলে যাবে। এবার লক্ষ্য হবে কী করে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঠেকানো যায়, কী করে মানুষ তার বিভিন্ন ঋণ শোধ করতে পারে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন এটা হবে একটা দীর্ঘমেয়াদী লড়াই, কারণ আমাদের এতদিনের চিন্তা-ভাবনার সংস্কার কখনোই রাতারাতি বদল হবে না।

এই দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হবে নারীকে তার নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে দেওয়া। এ যে কত কঠিন কাজ তা আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। সরকারি, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে না। এই সমস্যাটির নানা মাত্রা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, জট ছাড়ানো কঠিন। খাতায়-কলমে বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হয় না। কেন হয় না, তার বিবিধ সমস্যা নিয়ে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

২ নম্বরের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

১। নারীবাদ বলতে কি বোঝ ?

উত্তর নারীবাদ হল এমন একটি মতবাদ যেখানে নারীকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে বলা হয়। এই মতবাদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরোধীতা করে। 'নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন' এই মানসিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে নারীবাদ। নারীকে পুরুষের সমান মানবিক অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা নারীবাদের লক্ষ্য।

প্রশ্ন

২। নারীকে পুরুষের সমান বা নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একথা বলার অর্থ কি ?

উত্তর নারীবাদীরা নারী ও পুরুষের দেহগত লিঙ্গ পার্থক্য বা জৈব-পার্থক্য অস্বীকার করেন না, তাঁরা যা অস্বীকার করেন তা হল নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ সৃষ্ট কৃত্রিম লিঙ্গ ভূমিকাগত পার্থক্য। পুরুষ হবে বলিষ্ঠ, স্বনির্ভর, আক্রমনাত্মক আর নারী হবে লাজুক-নম্র, পুরুষের উপর নির্ভরশীল সেবাপরায়ণ— এইসব পার্থক্য মৌল পার্থক্য নয়, কৃত্রিম, দৈহিক দিক থেকে নারী পুরুষের পার্থক্য থাকলেও ভূমিকাগত দিক থেকে তারা সমান।

প্রশ্ন

৩। 'Sex' ও 'Gender' এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর 'Sex' ও 'Gender' এই দুটি ইংরাজি শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ 'লিঙ্গ' হলেও এই শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য রয়েছে 'Sex'-এর অর্থ দৈহিক কাঠামোগত লিঙ্গ বা জৈবিক লিঙ্গ। আর 'Gender' বলতে বোঝায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্ট নারী ও পুরুষের মনে তাদের পৃথক ভূমিকা সম্পর্কে লিঙ্গভেদের ধারণা।

প্রশ্ন

৪। নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রথাগত (রক্ষণশীল) মতবাদের বক্তব্য কি ?

উত্তর সাবেকী বা প্রথাগত (রক্ষণশীল) মতবাদ অনুসারে যেহেতু নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য আছে সুতরাং সমাজেও তাদের ভূমিকা ও স্থান এক হতে পারে না। সমাজে পুরুষের ভূমিকা হবে প্রধান কারণ তারা দৈহিকদিক থেকে বলশালী তাই তারা হবে রক্ষক এবং নারী হবে পুরুষের অধীন।

প্রশ্ন

৫। নারী ও পুরুষের সমাজিক ভূমিকা সম্পর্কে রক্ষণশীল মতবাদের সমর্থক কয়েকজন মনীষীর/দার্শনিকের নাম লেখো।

উত্তর পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যেও বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই নারী-পুরুষের সম্পর্কে রক্ষণশীল মতের সমর্থক। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, টমাস অ্যাকুটনাস, মনু প্রমুখ নারীকে পুরুষের অধীন, পুরুষ অপেক্ষা হীন বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন

৬। রক্ষণশীলগণ নারী-পুরুষের ভূমিকাগত পার্থক্যকে প্রতিষ্ঠা করতে কোন যুক্তির

সাহায্য নিয়েছেন ?

উত্তর নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে বক্ষণশীল যুক্তিটি হল— (১) স্বভাব ধর্মের ভিন্নতা অনুসারে মানুষের কর্ম ও তার প্রতি সমাজের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

(২) নারী ও পুরুষের প্রকৃতি (স্বভাবধর্ম) ভিন্ন ভিন্ন। অতএব

(৩) নারী ও পুরুষের কর্ম ও তাদের প্রতি সমাজের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হবে (অর্থাৎ সমাজে নারী ও পুরুষের স্থান ও ভূমিকা ভিন্ন হবে)।

প্রশ্ন

৭। সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণ কি ?

উত্তর সমাজে প্রকট লিঙ্গ বৈষম্যের মূলে রয়েছে দুটি বিষয়— একটি হল মাতৃসম্ভূত (matrilinecal) সমাজ ব্যবস্থায় উচ্ছেদ ঘটিয়ে পিতৃতান্ত্রিক (Patgeriarchel) সমাজব্যবস্থার পত্তন এবং দ্বিতীয়টি হল জন্মরহস্য সম্পর্কে মানুষের বোধ বা চেতনা।

প্রশ্ন

৮। নারীবাদী নৈতিকতার মূল বক্তব্য কি ?

উত্তর নারীবাদের মূল বক্তব্য হল—নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বভাবগত কোনো পার্থক্য নেই। নারীও মানুষ পুরুষও মানুষ। 'মানুষ' হিসাবে পুরুষ নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়, নারী পুরুষ অপেক্ষা অপকৃষ্টও নয়। কৃত্রিম সমাজসৃষ্ট পার্থক্য দেখিয়ে নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা নৈতিক দিক থেকে অন্যায়।

প্রশ্ন

৯। নারীবাদের প্রধান গোষ্ঠী কয়টি ও কি কি ?

উত্তর নারীবাদের প্রধান গোষ্ঠী দুটি। উদারপন্থী বা নরমপন্থী (liberal) এবং চরমপন্থী (radical)।

প্রশ্ন

১০। কয়েকজন উদারপন্থী নারীবাদীর নাম উল্লেখ করো।

উত্তর পাশ্চাত্যের কয়েকজন উদারপন্থী নারীবাদী হলেন— শ্রীমতি জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, শ্রীমতি থম্‌সন্, মেরি উলস্টোনক্র্যাফট, জেন ইংলিশ, সিমোঁ দ্য বুভোয়ে প্রমুখ এবং প্রাচ্যের উদারপন্থী নারীবাদীগণ হলেন—গান্ধীজী, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বেগমরোকেয়া, শেফালী মৈত্র, অমর্ত্য সেন, তসলিমা নাসরিন, মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

প্রশ্ন

১১। নারী ও পুরুষের অধিকারভেদের বিরুদ্ধে উদারপন্থী নারীবাদীদের যুক্তিটি কি ?

উত্তর নারী ও পুরুষের অধিকার ভেদের বিরুদ্ধে উদারপন্থী নারীবাদীদের যুক্তিটি হল—

(i) যদি দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রাসঙ্গিক পার্থক্য না থাকে তাহলে তাদের প্রতি একইরকম আচরণ করা হবে উচিত কাজ।

(ii) নারীও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রাসঙ্গিক পার্থক্য নেই।

(iii) অতএব নারী ও পুরুষের প্রতি সমান আচরণ করা উচিত।

প্রশ্ন

১২। নারীর সমাজগত ভূমিকা সম্পর্কে দার্শনিক মিল কি বলেছেন ?

উত্তর সমাজে সাধারণ মানুষের অভিমত হল স্ত্রীরূপে এবং মাতারূপে কর্তব্য পালনই নারীর স্বভাব অনুসারে

যথোচিত কর্ম। কিন্তু মিলের মতে এর উল্টোটাই ঠিক। নারীকে যদি কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, যে সব কাজকে নারীর স্বভাব সম্মত বলা হয় আসলে সে সবই তার স্বভাব-বিরোধী কাজ।

প্রশ্ন

১৩। আধুনিক নারীবাদের অন্যতম প্রবীন প্রবক্তা সিমোঁ দ্য ব্যুভোয়ার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর বুভোঁয়া তাঁর 'Second Sex' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন যে, মানুষের ইতিহাসে এ যাবৎ পুরুষকে স্বসত্ত্বারূপে গণ্য করা হলেও নারীকে পরসত্ত্বারূপে গণ্য করা হয়েছে। মানব সমাজে মেয়েলীভাবাপন্ন নারী অথবা পুরুষালী ভাবাপন্ন পুরুষরূপে কেউ জন্মায় না। ঐ প্রকার নারী ও পুরুষের ধারণা সমাজ কর্তৃক আরোপিত। নারীকে সমাজের বৈষম্য-বন্ধন ছিন্ন করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

প্রশ্ন

১৪। সাবেকী দর্শনের 'মানুষ' প্রত্যয়টি সম্পর্কে উদারপন্থী নারীবাদের অভিযোগ কী ?

উত্তর নব্য নারীবাদীরা অনেকেই সাবেকী দর্শনের 'মানুষের' প্রত্যয়টিকেই পুরুষকেন্দ্রিক প্রত্যয়রূপে দোষ দুষ্ট বলেন।

প্রশ্ন

১৫। 'মানুষ হল বিচারশীল জীব'—অ্যারিস্টটল প্রদত্ত মানুষের এই সংজ্ঞাটিকে উদারপন্থী নারীবাদীরা কেন অস্বীকার করেছেন ?

উত্তর সাবেকী সমাজের ধ্যান-ধারণা অনুসারে 'বিচারশীলতা' পুরুষের ধর্ম, নারীর ধর্ম হল আবেগ প্রবণতা। কাজেই নারীদের রক্ষণশীল প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসীরা পরিপূর্ণ মানুষ বলে মনে করেন না। নারীবাদীরা বলেন 'বিশুদ্ধ বিচারশীলতা' আধুনিক মনস্তত্ত্ব অনুসারে অবাস্তব কারণ বিচারের সঙ্গে কোন না কোনভাবে আবেগ ও মিশ্রিত থাকে। কাজেই আধুনিক মনস্তত্ত্ব অনুসারে পুরুষ যেমন বিশুদ্ধ বিচারশীল নয়, নারীও তেমনি বিশুদ্ধ আবেগ প্রবণ নয়। নারীবাদীরা তাই বলেন, সমাজে 'মানুষে'র প্রত্যয়টাই পুরুষকেন্দ্রিক, বিষয় কেন্দ্রিক নয়।

প্রশ্ন

১৬। আধুনিক নারীবাদের প্রধান লক্ষ্য কি ?

উত্তর নারীকে তার নারীত্বের বিশেষ গুণ মাতৃত্ব, সেবাপরায়ণতা, মমত্ব ইত্যাদিকে স্বীকার করে পুরুষের সমান মর্যাদা এবং অধিকারে প্রতিষ্ঠা করাই নারীবাদের প্রধান লক্ষ্য কারণ সমাজে পুরুষের কার্যাবলীর মত নারীর গুণাবলী ও কার্যাবলীর গুরুত্বও সমান প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন

১৭। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত ?

উত্তর গান্ধীজীর মতে নারীকে তার ইচ্ছা অনুসারে বিকশিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সামাজিকভাবে অন্যায় ও আইনগতভাবে অপরাধ। একথা ঠিক যে দৈহিক দিক থেকে নারী অপেক্ষা পুরুষ বলশালী তবে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা দৈহিক পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল নয় তা নির্ভর করে অন্তরের শক্তির উপর। অন্তরের শক্তিতে নারী পুরুষের চেয়ে কোনমতেই হীনবল নয়।

প্রশ্ন

১৮। বিষয়গত পার্থক্য বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর বিষয়গত পার্থক্য বলতে বোঝায় এমন পার্থক্য যাকে বিশেষ এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে না জেনে, মুক্তমনে স্বচ্ছবুদ্ধিতে, সংস্কারমুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে জানা যায় এবং যাকে, বাস্তবে সম্ভব না হলেও নীতিগতভাবে সবার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন

১৯। নারীকে সমাজে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি প্রয়োজন ?

উত্তর নারীকে সমাজে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন হল রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।

প্রশ্ন

২০। লিঙ্গ বৈষম্য কিভাবে 'মানুষের অধিকার'কে খর্ব করে ?

উত্তর নারী এবং পুরুষের মধ্যে যখন প্রাসঙ্গিক কোনো ভেদ নেই তখন নারীর অধিকারকে খর্ব করার অর্থ হল মানুষের অধিকারকে খর্ব করা কারণ নারীও মানুষ। পুরুষের মত নারীও মানবীক গুণ ও লক্ষণযুক্ত সম্পূর্ণ একজন মানুষ। লিঙ্গ বৈষম্য মানুষ হিসেবে নারীর প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে মানবাধিকারকে খর্ব করে।

প্রশ্ন

২১। নারীবিদ্যা বা Women's Studies কি ?

উত্তর নারীবিদ্যা বা Women's Studies এমন এক শিক্ষায়তনিক ক্ষেত্র যা লিঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠন পরীক্ষার সময় নারীবাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা অধ্যয়নকে কেন্দ্রে রেখে নারীবাদী এবং আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতিগুলির স্বপক্ষ রচনা করে থাকে।

নম্বরের অনতীদীর্ঘ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

১। জেন্ডার বা লিঙ্গের প্রকারভেদ (Type of Genders) সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর Sex ও Gender-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় Sex তিন প্রকার। যথা— Male, Female ও Third Sex। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ জৈবিক লক্ষণের অধিকারী Male-কে First Sex, স্ত্রী জৈবিক লক্ষণের অধিকারীদের Female বা Second Sex বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তবে এই দুই প্রকার জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি ছাড়াও সমাজে আর এক ধরণের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যার শরীরে মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই জৈবিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান কিন্তু Male বা Female বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই সম্পূর্ণ নয়। এই ধরণের মিশ্র প্রকৃতির Sex-কেই Third Sex হিসেবে প্রকাশ করা হয়, যাদের বঙ্গসমাজে 'বৃহন্নলা' নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকে।

Gender বলতে সমাজে প্রাধান্যের ভিত্তিতে জৈবিক সত্ত্বার অধিকারী ব্যক্তিদের স্তরবিন্যাসকেই বোঝায়। যে সমাজে যে জৈবিক সত্ত্বার অধিকারী ব্যক্তি বিশেষ প্রাধান্য, প্রভাব ও ক্ষমতা ভোগ করে সেই সমাজে সেই Gender Masculine Gender নামে পরিচিত হয়। ঐ সমাজে বিপরীত জৈবিক সত্ত্বার অধিকারী এবং অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদা, প্রভাব ও ক্ষমতার অধিকারীরা Feminine Gender নামে পরিচিত হন। এই দুই ধরণের Gender ছাড়াও তৃতীয় Sex-এর বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের Third Gender রূপেই অভিহিত হয়ে থাকে।

সমাজে এই Third Gender ছাড়াও আর এক ধরণের Gender-এর অস্তিত্ব ও প্রভাব আমাদের সমাজে আছে। সংখ্যায় খুবই নগণ্য হলেও এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে এরা পৃথক সত্ত্বার অধিকারী। অনেক সময়

Male বা পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে উন্নত শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের কাঙ্খিত Gender Feminine-এ যেমন যেতে চায়, তেমনি বেশ কিছু মহিলাও Femine Gender পরিত্যাগ করে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে Masculine Gender-এ পরিণত হতে চায় বা হয়। এদের যেমন Masculine বা Femine Gender বলা যায় না, তেমনি Third Gender-ও বলা যায় না। কারণ Third Gender মানেই শরীরে যেমন বিশেষ ধরণের যৌন বৈশিষ্ট্য বর্তমান (যা Male Sex বা Female Sex কোনোটির মতোই নয়) তেমনি সমাজ তাকে বিশেষ স্বীকৃতি ও দিয়েছে। 'Trans' শব্দের অর্থ 'ওপারে' বা 'অতিক্রম করে'। অর্থাৎ, যারা নিজেদের যৌন বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে অন্য বিপরীত যৌন বিশিষ্টোর অধিকারী হতে চায় তাদের Trans Gender বলা হয়ে থাকে। এদের Third Sex বলা যায় না। আবার Third Sex-দেরও Third Gender বলা যায় না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশি।

প্রশ্ন

২। পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর 'Patriarchy' শব্দটির অর্থ হল পিতৃতন্ত্র। অর্থাৎ পিতা পরিচালিত সমাজ। অন্য কথায় বলতে গেলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হল পুরুষ প্রাধান্যবিশিষ্ট সমাজ। এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের কর্তৃত্বই স্বীকৃত। ফলে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা যথাযথভাবে এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় রক্ষিত হয় না। এই ধরণের সমাজে নারী অত্যাচারিতা, অপমানিতা, নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা। এই ধরণের সমাজব্যবস্থা হল একপ্রকার বিশেষ রূপের সমাজব্যবস্থা। ভারতীয় বাস্তবতায় পিতৃতন্ত্রের চরম রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল মধ্যযুগে, যখন নারীর ওপর নেমে এসেছিল চরম আঘাত। সমাজব্যবস্থা উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। উদ্ভব ঘটেছে নতুন সমাজব্যবস্থার কিন্তু তবুও মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিদর্শনস্বরূপ পুরুষ প্রাধান্যবিশিষ্ট সমাজ নারীর ওপর অত্যাচার ও নারীর ওপর নির্যাতনের মতো পরাকাষ্ঠাকে বহন করেই চলেছে; তাকে পরিহার করে গুণগতভাবে উন্নত ও নতুন রূপ লাভ করতে পারে নি। বর্তমানে অবশ্য (কিছুটা পরিমাণে হলেও) পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লেগে ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তার রুক্ষ রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে কিছুটা মোলায়েম রূপ লাভ করেছে বলা যায়। কারণ, বর্তমানে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজেও অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা, শিল্প, গবেষণা এমনকি সামরিক ক্ষেত্রে সব জায়গাতেই পুরুষের সঙ্গে নারীও সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে। কিন্তু তাই বলে সমাজ যে পুরোপুরি বদলে গিছে তা বলা যাবে না; বরং অন্য আরও এক দিক থেকে নারী সমাজের ওপর নেমে আসছে চরম আঘাত। পথে ঘাটে, ট্রামে, বাসে, বালিকা বিদ্যালয়ের গেটে সর্বত্রই নারীকে উত্যক্ত করা এবং নারীর লাঞ্ছনা ও অপমান ঘটে চলেছে অহরহ। এটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পচা-গলা দেহের সর্বশেষ পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়তো সমাজ একদিন তার পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে; পুরুষের ভন্ডামির মুখোশকে ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হবে; হয়তো একদিন নারীশক্তির জাগরণ ঘটবে কিন্তু ততদিনে কত বাবা-মাকে তাদের কন্যাদের হারাতে হবে, কত স্বামীকে হারাতে হবে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে, কত ভাইদের হারাতে হবে তার প্রিয়তম ভগিনীদের—তা কে জানে।

প্রশ্ন

৩। পিতৃতান্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Patriarchy) সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর ***প্রথমত,*** পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক নিয়মকানুন, নীতি ইত্যাদি নির্ধারণ করে পুরুষই। এ বিষয়ে নারীর কোনো অধিকারই থাকে না।

দ্বিতীয়ত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিষয়েও পুরুষই প্রাধান্য ভোগ করে থাকে, এই বিষয়টিতেও নারীর কোনও ক্ষমতা থাকে না।

তৃতীয়ত, সমাজে ক্ষমতা ভোগের বিষয়ে অর্থাৎ, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের বিষয়েও পুরুষই প্রাধান্য

পায়। এ বিষয়েও নারীর কোন ক্ষমতা নেই। এই ধরণের সমাজে এমনকি স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে ভোট দিতেও হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সাংস্কৃতিক জগতেও পুরুষের প্রাধান্যই বজায় থাকে। অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষই কৃতিত্ব দেখায় ও প্রাধান্য বিস্তার করে। নারীর দক্ষতা ও প্রতিভা থাকলেও তা অনেক সময়েই দমিয়ে রাখা হয়।

চতুর্থত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুত্রসন্তানই বিশেষ প্রভাব, ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে শুধু তাই নয়; খাবারদাবার, সুযোগ-সুবিধাও পুত্রসন্তানই বেশি পায়। কন্যাকে সবরককম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদাও দেওয়া হয় না।

পঞ্চমত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কন্যাসন্তানকে সাংসারিক কাজকর্ম বাল্যকাল থেকেই শেখানো হতে থাকে। ধীরে ধীরে সাংসারিক কাজের দায়দায়িত্ব তাদের অনেকটাই পালন করতে হয়। বাবার নির্দেশ বা মা শুনতে যেমন বাধ্য হয় তেমনি মায়ের কাছে থাকতে থাকতে মায়ের মতোই বাবা ও দাদাদের নির্দেশ মেনে নিতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে কন্যা।

ষষ্ঠত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নিজ ক্ষমতা ও আধিপত্যের কারণে অফিসে, আদালতে, স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কখনও আবার তার দুর্বলতার সুযোগ নেয় অথবা তার মর্যাদা ও সম্মানকে আঘাত দেয়। নারী স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র আইন তৈরি করলে অনেক সময় আবার সেই বিষয়টিকে নিয়েও নারীর উপস্থিতিতে ব্যঙ্গ করে, তাদের মানসিকভাবে আহত করার চেষ্টা করে।

এছাড়া নারীদের বিভিন্ন স্থানে উত্যক্ত করা ও ইভটিজিম-এর মতো ঘটনা তো অহরহ ঘটেই থাকে। অর্থাৎ পরিশেষে বলা যায় যে পিতৃতন্ত্র এমন এক ধরণের সমাজব্যবস্থা যেখানে নারীর মর্যাদা সবক্ষেত্রেই ভুলুণ্ঠিত। তার বাস্তব অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায় এই চরম পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যুগ যুগ ধরেই কায়েম হয়ে আসছে।

একজন পুরুষ শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হলে সে তার নিজের ও খুব বেশি হলে তার পরিবারের উন্নতি ঘটাতে পারে কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হলে সে তার শিক্ষার, পরিবারের ও সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে পারে; শুধু বর্তমান প্রজন্মের নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাজও নারী করে। কারণ, সন্তান লালনপালন ও তাকে বড় করে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার কৃতিত্ব নারীরই। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কঠোরতা কখনোই কাম্য নয়। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ পিতৃতন্ত্র বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই কাঙ্খিত।

প্রশ্ন

৪। মোটিভেশান তত্ত্ব ও নারীর ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর Motivation Theory অনুযায়ী মনুষ্য সমাজ দুই ধরণের Motive নিয়ে চলে, যথা— (i) In order Motive এবং (ii) Because of Motive. In order Motive হল সাময়িক পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অর্থাৎ, এই ধরণের মানসিকতায় 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতিকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী আজ যে শত্রু কাল সে বন্ধুতেও পরিণত হতে পারে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ, পরিস্থিতিই বলে দেয় কে বন্ধু হবে, আর কে শত্রু হবে। সময়ের সাথে পরিস্থিতি বদলে যায়। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষকে পৃথক পৃথক নীতিও গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়।

কিন্তু Because of Motive ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয় যে, কেউ যদি কারও সঙ্গে একবার শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে তবে সে কখনও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না, পরিস্থিতি যতই পরিবর্তিত হোক। পুরুষের সাথে মহিলার সম্পর্ক লিঙ্গগত বৈপরীত্যের কারণে জৈবিক তাড়নায় মধুরতার। কিন্তু যে পুরুষ মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে সন্তুষ্ট সেই কেবল মহিলাদের প্রতি ভালো আচরণ করতে পারে। পুরুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি তার যৌন লালসাকে তৃপ্ত করা যা প্রতিভাত হয় নারীর প্রতি শত্রুতা সুলভ আচরণের মধ্য

দিয়ে। তাই নারীর উচিৎ পুরুষের সাথে Because of Motive নিয়েই আচরণ করা। যে মহিলা In order motive নিয়ে চলেন তিনি যে যথেষ্ট নির্বুদ্ধিতার কাজ করেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন

Sex ও Gender পার্থক্য আলোচনা করো।

উত্তর প্রথমত, Sex একটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ধারণা। যার ভিত্তিতে Sex Male হবে, Female হবে না 3rd sex তা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে Gender হল একটি সামাজিক নির্মাণ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয় ব্যক্তি Masculine হবে, Feminine হবে, নাকি Trans gender হবে।

দ্বিতীয়ত, Sex দৈহিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য বলে তা কখনোই অর্জন করা যায় না। তা হল পিতামাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত এক দৈহিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, এটি সহজাত। কিন্তু Gender একটি সামাজিক নির্মাণ বলে তা অর্জন করতে হয়। সমাজভেদে লিঙ্গের বা Sex-এর Gender অনুযায়ী চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

তৃতীয়ত, Sex-এর বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, সাধারণভাবে এর পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। বর্তমানে উন্নত শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে Sex-এর পরিবর্তনের সাফল্যের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও এর সার্বিক সাফল্য আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, Gender একটি সামাজিক নির্মাণ। তাই এর ধারণার পরিবর্তন সম্ভব। সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলে প্রাধান্য বিস্তারকারী Masculine gender যেমন নিজেকে Masculine বলে পরিচিত করে, তেমনি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক হলে প্রাধান্যবিস্তারকারী মহিলা শ্রেণিও নিজেদের Masculine gender-এ পরিচিত করতে পারে। অর্থাৎ সময় ও অবস্থাভেদে Gender-এর ধারণার পরিবর্তন সহজেই সম্ভব।

চতুর্থত, Sex-ওপর কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে খাটে না। কারণ, মানুষের জৈবিক বা দৈহিক কাঠামোকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। অন্যদিকে Gender ধারণাটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। কারণ, বিষয়টির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ আছে, আছে সমাজেরও নিয়ন্ত্রণ।

পঞ্চমত, Sex যেহেতু জৈবিক ধারণা জীবদেহের হরমোন নিয়ন্ত্রিত প্রভাবও এর ওপর কাজ করে। হরমোনের কারণেই মহিলা একজন মহিলা sex বা Female Sex এবং পুরুষ একজন পুরুষ Sex বা Male Sex।

অন্যদিকে Gender আংশিকভাবে হরমোন প্রভাবিত। কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশই মানসিক। জৈবিক কোনো বিষয়ের প্রভাব এর ওপর নেই।

ষষ্ঠত, Sex জন্মমুহূর্ত থেকে সৃষ্ট আমৃত্যু একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ Sex-এর চিহ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত বহন করে চলতে হয়। এটি একটি স্থায়ী লক্ষণ। অন্যদিকে Gender স্থায়ী লক্ষণ নয়। মানুষ ইচ্ছে করলেই অনুকূল সমাজব্যবস্থার সূচনা করে Gender-এর ধারণা পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

১০ নম্বরের দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

১। সমাজের প্রেক্ষিতে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা (Definition of Gemnder) ব্যাখ্যা করো।

উত্তর 'Sex' একটি ইংরেজি শব্দ। এর সাধারণ অর্থ লিঙ্গ। কিন্তু এর বিশেষীকৃত অর্থ হল যৌন লক্ষণ বা চিহ্ন। অর্থাৎ, যেসব দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে আমরা সমাজস্থ মানুষদের দুটি প্রধান পৃথক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথক করতে পারি সেই দৈহিক বা জৈবিক লক্ষণসমূহকেই বলা হয়া থাকে Sex। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে বলা যায়, Sex হল নারী ও পুরুষের মধ্যে পৃথকীকরণের জৈবিক বৈশিষ্ট্য। Sex জন্ম মুহূর্ত থেকেই সৃষ্ট। আরও

পরিষ্কারভাবে বলা যায় মাতৃজঠরে ভ্রূণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই Sex নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই 'Sex' হল প্রাপ্ত মর্যাদা। কারণ 'Sex'-এর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো সঙ্গে নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তাই Sex-এর ওপর কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। একে পরিবর্তনও করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমাদের সমাজের দু'টি পরস্পর বিপরীতধর্মী Sex হল পুরুষ ও নারী। পুরুষ ও নারী উভয়েরই শারীরিক গঠন, যৌন বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নসমূহ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এমনকি বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাদের শরীরের প্রতিটি কোশ অঙ্গানুর গঠনও পৃথক ধরণের। তাই নারী যৌন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাউকে দেখলে আমরা তাকে নারী বলি এবং পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কাউকে দেখলে সহজেই তাকে পুরুষ বলে চিহ্নিত করতে পারি। শরীরতত্ত্বগত দিক দিয়ে আলোচনা করলে বলা যায় যে উভয় ধরণের Sex-এর কোশে ক্রোমোজোমের গঠন, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে ক্ষরিত হরমোন ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক ধরণের। তাই বলা যায় Sex সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল এবং কোনো ব্যক্তি যে জৈবিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় মৃত্যু পর্যন্ত তার সেই জৈবিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। বর্তমানে অবশ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটেছে এবং শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অনেকে তাদের দৈহিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপরীত Sex-এ চলে যাচ্ছেন বা পরিণত হচ্ছেন। তবে এই প্রচেষ্টার পুরোটাই গবেষণামূলক এবং অনেকক্ষেত্রে সফল হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বলা যায় Sex সম্পূর্ণরূপে বিশেষ জৈবিক বা দৈহিক রূপেরই প্রতিফলন।

ইংরেজিতে অপর একটি শব্দ আছে যা হল 'Gender'। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ লিঙ্গ। তবে Gender শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ পৃথক। এটিকে একটি 'সামাজিক নির্মাণ' হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর অর্থ দৈহিক বা জৈবিক লক্ষণ অথবা জৈবিক চিহ্ন নয়। এটি বিশেষ ধরণের একটি প্রাপ্ত মর্যাদাও নয়; এটি হল অর্জিত কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলির ধারণা। ব্যক্তি সমাজের বাস করতে গিয়েই বিশেষ ধরণের এইসব গুণাবলি পৃথক পৃথক রূপে অর্জন করে। তাই ঐ সব গুণাবলীর পার্থক্যের ভিত্তিতেই তাদের Gender শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি স্থায়ী প্রকৃতিসম্পন্ন ধারণা নয়। সমাজকেন্দ্রিক মর্যাদার প্রশ্ন হিসেবে অর্জিত মর্যাদা 'Gender' সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও পৃথক হতে বাধ্য; যা Sex-এর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। Gender role হল প্রতিটি sex-এর কাঙ্খিত attitude বা আচরণ যা কোনো নির্দিষ্ট সমাজ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করে। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন সমাজে শিক্ষার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই হল gender এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে ভূমিকা সে পালন করে তাই হল gender role। সমস্ত সামাজিক interaction বা ক্রিয়াকলাপে এবং যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এইসব interaction গুলো ঘটে থাকে সেগুলি সবই কোনো না কোনোভাবে লিঙ্গায়িত gendered। এই gendering বা লিঙ্গায়ন সমাজবিদ্যার তাত্ত্বিক ও ফলিত দিককে পুনর্গঠিত করেছে। Gender একটি সামাজিক ধারণা এবং তা অর্জন করতে হয় বলে যে কোনো ব্যক্তির Gender তার মর্যাদা, ভূমিকা ও সুযোগসুবিধা নির্ধারণ করে দেয়। আবার মর্যাদা, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামাজিক বিষয়। তাই জাতি ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা, শ্রেণি কাঠামো ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে gender ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত অথবা বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীলও বটে।

সমাজস্থ যেসব ব্যক্তি নিজের শারীরিক ক্ষমতা বা তেজের মাধ্যমে নিজের Sexual Organ-কে অন্যের ওপর ব্যবহার করে Sexual Pleasure লাভ করেন তিনি Masculine Gender নামে পরিচিত। কারণ Masculine শব্দটির অর্থই হল তেজস্বী বা বলিষ্ঠ্য বা সাহসী। অন্যদিকে, যারা Masculine gender-এর কাছে পরাজিত তাঁরাই Feminine Gender নামে পরিচিত। মার্কস অনুগামী নারীবাদীরা মনে করেন যেকোনো ধরণের সমাজব্যবস্থাতেই নারী অসাম্য ও শোষণের শিকার। শারীরিক ক্ষমতা ও প্রভাবের জোড়ে পুরুষ অসাম্য ও নিজস্ব আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার জন্যই নারীকে অবদমিত করে রেখেছে। সমাজে সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের ভিত্তিতেই নির্মিত হয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য। তাই লিঙ্গ (Gender) সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পূর্ণরূপে সামাজিক সচেতনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, সামাজিক রীতিনীতি

কোনো নির্দিষ্ট মর্যাদার অধিকারীকে তার সুযোগ ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়। তাই বলা যায় জন্মমুহূর্তে কোনো নারী বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য (sex) নিয়ে জন্মায় ঠিকই কিন্তু কেবলমাত্র তার জন্যই সে নারী হিসেবে চিহ্নিত হয় না; সমাজে বাস করতে করতেই পুরুষশাসিত সামাজিক ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের চাপে সে নারী হয়ে ওঠে। সিমোন দ্য বোভয়ার এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'One is not born but rather becomes a woman.'

অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থাতেই পুরুষ তার শোষণ, শাসন আর অত্যাচারের শিকার করে নারীকে। তাই নারী হয় Feminine আর পুরুষ হয় Masculine gender। মনোবিজ্ঞানী Frued তাঁর যৌনতত্ত্বে নারীর শরীরকে অসম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নারীর শারীরিক অসম্পূর্ণতার জন্য নারী নিম্ন মর্যাদার অধিকারী বা Feminine, কিন্তু সামাজিক প্রগতি ও সভ্যতার ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে নারী যদি সন্তান উৎপাদন না করে। সামাজিক দায়দায়িত্ব, কর্তব্য পালন, সন্তান উৎপাদন ও ধারণ, সাংসারিক সমস্ত গৃহস্থালী কর্মসম্পাদন, পুরুষকে সঙ্গ ও আনন্দদান ইত্যাদি ভূমিকায় নারীর অসামান্য অবদানের কথা লক্ষ্য করলে কখনোই তাকে Feminine বলা যাবে না।

❖ যে যে কারণে নারী Feminine gender-এ পরিণত হয়েছে—

১। ক্ষমতার জোরে নারীকে ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা, নারীদের ওপর রোমিও বৃত্তিগত উৎপীড়ন ইত্যাদি অত্যাচার দীর্ঘকাল ধরে সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই পুরুষ চালিয়ে আসছে।

২। পারিবারিক অত্যাচার ও নির্যাতনে পুরুষ যেমন নারীর ওপর অত্যাচার চালায়, তেমনি তার দোসর হয় অপর নারী। অর্থাৎ নারীর শত্রু হয় নারীরাই।

৩। বহুযুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজ নারীর ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং অচার অনুষ্ঠানগত নিপীড়ন ও নির্যাতন।

৪। পুরুষ চিরকাল নারীকে গৃহস্থালীর কাজকর্মেই আবদ্ধ রেখেছে। ফলে বাইরের জগতটাকে দেখার সুযোগই নারীর ঘটেনি।

৫। পণপ্রথা, সতীপ্রথা ইত্যাদির মতো সামাজিক কুপ্রথাগত অত্যাচার ও নির্যাতন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে নারীর ওপর।

৬। সব সমাজে সবকালেই বাবা মা চান তাদের ছেলে হোক। কারণ মেয়ে হলে তাকে বড় করে তোলার জন্য বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়; কন্যাপণ হিসেবে প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থও বেরিয়ে যায়। মা নিজে নারী হলেও মনেপ্রাণে চান কন্যাসন্তান না হোক। কারণ, কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে সমাজে প্রতি পদে পদে তাকে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হতে হয়। বাড়িতে তাদের দাসীর মতোই ব্যবহার করা হয়। পুত্রের জন্ম দিলে মা নিজেকে অনেকটা গরবিনী বলে মনে করেন। এই মানসিকতাও নারীকে Feminine gender-এ পরিণত করেছে।

৭। আজও নারীর বিবাহ দেওয়া হয় এবং তার আয়োজন করে পুরুষশাসিত সমাজ। অন্যদিকে, ছেলেরা বিয়ে করে। এক্ষেত্রেও নারীর অসামর্থ্য আরও একবার উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে মনুর মতো কয়েকজন ঋষির কতকগুলো বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

(ক) ঋষি মনু বলেছেন, স্বামী চরিত্রহীন, কামুক ও সৎগুণ থেকে বিচ্যুত হলেও ভারতীয় মহিলারা স্বামীকে পূজা করেই আসছে। *(Manu 5-514).*

(খ) যাজ্ঞবল্কের মতে, ভারতীয় মহিলারা তাদের স্বামীদের কথামতো চলে এবং একে তাদের পবিত্রতার কর্তব্য বলে মনে করে। *(Yujanavalkya 1-18)*

(গ) মনু বলেছেন, ভারতীয় মহিলারা স্বামীর সেবা করে স্বর্গে গিয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। *(Manu 5-145)*

(ঘ) আরথির মতে ভারতীয় মহিলারা মনে করে যে স্বামীর পা ধোয়া জল পান করলে সে উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী হবে। *(Arthi 136-187)*

(ঙ) বশিষ্ট্য বলেছেন, স্বামীভক্তি ছাড়া মেয়েদের কাছে কিছু নেই এবং স্বামীভক্তি ছাড়া মৃত্যুর পরে সে তার জীবনের পথে স্থান পাবে না। *(Basistha 12-21)*

(চ) মনু বলেছেন, যে মেয়ে বাবার পরিবারের গর্ব করে এবং স্বামীকে অমান্য করে সে গোল্লায় যায়। *(Manu 8-37)*

(ছ) অংগারাস বলেছেন, যে মেয়ে স্বামীকে অমান্য করে তার হাতে কারও খাওয়া উচিত নয়। কারণ সে মেয়ে কামুক। (Angaras 69)

(জ) যদি স্বামীর বদ অভ্যাসের জন্য এবং মদ্যপান বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোনো নারী স্বামীকে অমান্য করে তবে তিন মাস তাকে গহনা ও পোশাক-পরিচ্ছদ পড়তে দেওয়া উচিৎ হবে না।

এসব ছাড়াও কোনো কোনো সমাজ (Manu 10-78) আবার নারীর শরীর দূরে থাক, মুখ দেখানোকেই নিষেধ করে দিয়েছে। তাই বলা যায়, সামাজিক অনুশাসন ও শারীরিক অসামর্থ্যের কারণেই নারী, পরিবার, নিজের সংকীর্ণ অবস্থাকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবেই শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, ভ্রান্ত বিশ্বাস ইত্যাদি কারণে নিজের সব অধিকার আর স্বাধীনতাকে পুরুষের কাছে ধীরে ধীরে অর্পণ করেই সামাজিক স্তর বিন্যাসের অধঃস্তন Gender হিসেবে Feminine Gender-এ পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন

২। লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ (Social Construction of Gender) এই বিষয়টি আলোচনা করো।

উত্তর লিঙ্গ সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি ধারণা। সমাজের প্রভাবেই লিঙ্গ বা Gender প্রভাবিত হয়। সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণিই Gender-এর চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। যে সমাজে যে Gender প্রাধান্য বিস্তার করে সেই Gender-ই সমাজে নিজেকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে এবং নিজের স্বার্থেই ক্ষমতাশালী Gender হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবশালী সামাজিক অভ্যাস, রীতিনীতি নিয়মকানুন ইত্যাদি সবকিছু বিষয়কে এমনভাবে তৈরি করে যে নিজের স্বার্থ যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারতে যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই ধরণের সমাজব্যবস্থা পুরুষশাসিত সমাজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেহেতু পুরুষ শ্রেণি এই সমাজব্যবস্থাকে পরিচালিত করে, তাই বাল্যকাল থেকে পুরুষ শিশুসন্তান বা পুত্রসন্তানকে বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। সামাজিক নিয়মকানুন, রীতিনীতি, খেলাধূলা, পঠনপাঠন, পোশাক, আচার-আচরণ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার উপরিসৌধের সবকিছুই রচিত হয় পুত্রসন্তানের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে, কন্যা সন্তানকে সর্বদাই এমনভাবে জীবন শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে সে ত্যাগ, তিতিক্ষা, যন্ত্রণা, অপমান, গ্লানি আর মনোবেদনাকে বুকে চেপে রেখে মুখে দেঁতো হাসি এনে শত দুঃখ আর কষ্টের মাঝেও 'ভালো আছি' কথাটি বলতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন মুণি-ঋষির বাণী, প্রাচীন মহাকাব্য যেমন—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদিতে যেসব উপাখ্যান ও কাহিনিগুলি বিবৃতি হয়েছে সেগুলোতে এইসব অবস্থাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন আলোচনা করলে দেখা যায় আদিম সাম্যবাদী সমাজ, যেখানে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না সেখানে Sex বা gender-এর মধ্যে কোনো পার্থক্যও ছিল না এবং সেই সমাজে পুরুষরাও বিশেষ মর্যাদা বা প্রাধান্য ভোগ করতে পারত না বরং সেই সমাজে নারীর সংখ্যা কম ছিল বলে নারীর মর্যাদাই ছিল বেশি। তাই সেই সমাজে নারীই প্রাধান্য ভোগ করত এবং কর্তৃত্বশালীও ছিল। পুরষ নিজস্ব জৈবিক চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে নারীর কাছে ছিল ভিক্ষুকস্বরূপ এবং নিজেদের প্রজাতি বা পুরুষ প্রজাতির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনেক পুরুষই এ কারণে মারা যেত।

কৃষিকাজ বা চাষবাস আবিষ্কার করেছিল নারী। পুরুষ পশুশিকারে বের হলে নারী গুহায় থেকে গুহার

পাশাপাশি জায়গায় চাষবাস করতে শুরু করল। এভাবেই নারী কালক্রমে হয়ে উঠল গৃহিণী। কোন অভিশাপে বা কোন অশীর্বাদে নারী কৃষিকাজের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তা জানা নেই; তবে চাষের পদ্ধতি আবিষ্কার করেই নারী যে নিজেকে গৃহবন্দি করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর থেকেই পুরুষ অপর এক পুরুষের সাথে নারীকে আর মিশতে দিল না, নিজের স্বার্থে। নিজেরই জৈবিক চাহিদাকে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তিসহকারে মেটানোর উদ্দেশ্যেই পুরুষ নারীকে করল গৃহবন্দি। নারী সেদিন বুঝতে পারে নি যে তার সৃষ্টি একদিন তারই চলার পথের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নারীর দ্বিবিধ উৎপাদনী ভূমিকার জন্যই আমরা ফসল ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীকে নারীমূর্তি রূপেই কল্পনা করে পূজা করি।

কৃষিকাজের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ হল খাদ্য উৎপাদক মানুষ। নারীর হাত থেকে উৎপাদনী ক্ষমতার ফসলস্বরূপ কৃষিকাজের পদ্ধতিকে পুরুষ আয়ত্ত করল; নারীকে সরিয়ে দিল তার অধিকার থেকে। নিজের সৃষ্টিকে পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে নারী হল সর্বহারা। ইতোমধ্যে পুরুষ চেষ্টা করতে শুরু করল কীভাবে নিজের বুদ্ধি, চাতুরি আর কৌশল দিয়ে নারীকে নিজের ভোগ্যবস্তু হিসেবে কাজে লাগানো যাবে; কীভাবে তাকে দিয়ে নিজের সমস্ত কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজ বদলেছে দ্রুত গতিতে। কৃষিভিত্তিক সমাজ রূপান্তরিত হয়েছে শিল্পভিত্তিক সমাজে কিন্তু সমাজব্যবস্থার লিঙ্গগত চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। পুরুষশাসিত সমাজে এইরূপ একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, 'পুরুষের পেটের কথা আদায় করার ক্ষমতা নিয়েই নারী জন্মায়'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে কথা সত্য হলেও বাস্তব অবস্থা বারে বারেই নারীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে শিল্পভিত্তিক সমাজেও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা আর শিল্পের কৌশল প্রথম আয়ত্ত করেছে পুরুষ। তাই নারীকে সে ক্ষমতার স্বাদ পেতে দিতে রাজী নয়। পুরুষ মনে করে শিল্পভিত্তিক সভ্যতার ইমারত সৃষ্টি করেছে সে নিজেই। তাই সেই ইমারতে নারীর কোনো অধিকার নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার ইত্যাদির কথা যেমন উঠে এসেছে; তেমনি উঠে এসেছে স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ইত্যাদির ধারণাও। ফলে ধীরে ধীরে নারীও সমাজ তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তবে সাম্যের কথা আর স্বাধীনতার কথা মুখে বললেই বাস্তবে কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ নিজের আধিপত্যকে বজায় রেখেছে; নারীকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মর্যাদার উচ্চতর কাঠামোয় উন্নীত হতে দেয়নি। তাই দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের মতো দেশ, যাকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা যায়, সেখানেও নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে অনেক পরে।

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে নারীর যথেষ্ট পরিমাণ অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল, যদিও পরিমাণে তা পর্যাপ্ত ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা ক্রমশ কমতে থাকে। মধ্যযুগে ভারতীয় নারীর মর্যাদা ও অধিকার বলতে কিছুই ছিল না বলা যায়। সে সময় নারীর ওপর পুরুষশাসিত সমাজের অত্যাচারের যে সীমা-পরিসীমা ছিল না তা সতীদাহের মতো প্রথার মাধ্যমে অত্যন্ত জ্বলন্তভাবেই ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী নারী স্বাধীনতার কথাকে কিছুটা পরিমাণে আমল দিতে শুরু করে। এই আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে Gender নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক নির্মাণ এবং Gender সম্পর্কিত ধারণা সমাজের প্রভাবেই প্রভাবিত।

প্রশ্ন

৩। লিঙ্গ পাতিত্ব (Gender Bias) বলতে কি বোঝ ?

উত্তর 'Bias' শব্দের অর্থ 'পক্ষপাতিত্ব' বা 'একপেশেভাব'। 'Gender Bias' শব্দের অর্থ লিঙ্গগত একপেশে ভাব অথবা লিঙ্গগতভাবে কোনো বিশেষ লিঙ্গের প্রতি ঝোঁক। প্রতিটি সমাজই লিঙ্গায়িত সমাজ। অর্থাৎ, প্রতিটি সমাজই কোনো একটি লিঙ্গের প্রতি বিশেষ আসক্তিকেই তুলে ধরে। ফলে প্রতিটি সমাজই স্বাভাবিকভাবেই পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। এই বিষয়কেই বলা হয় Gender Bias. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুরুষশাসিত সমাজের প্রভাবই বেশি। তাই এই সমাজে Masculine Gender-এর প্রতি পক্ষপাত দোষই

পরিলক্ষিত হয়। যার ফল ভোগ করতে হয় নারীসমাজ বা Feminine Gender কে। ফলে Feminine Gender দ্বিগুণ বঞ্চনার শিকার হয়। বিষয়টিকে অঙ্কের ভাষার মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, সমাজের সুযোগ সুবিধা যা আছে তার মোট পরিমাণ 4 একক। এই সুযোগ সুবিধা সমভাবে বণ্টিত হলে Masculine Gender হিসেবে পুরুষদের পাওয়া উচিত 2 একক এবং Feminine Gender হিসেবে মহিলাদের পাওয়া উচিত 2 একক। কিন্তু পুরুষশাসিত বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে Masculine Gender বা পুরুষদের প্রতি Biasness-এর কারণে Masculine Gender- কে সুযোগ দেওয়া হয় বা তারা সুযোগ ভোগ করে 2+1 একক = 3 একক। স্বাভাবিকভাবেই Feminine Gender সুযোগ সুবিধা লাভ করে—

মোট	4 একক
Masculine	– 3 একক
Feminine	1 একক

অর্থাৎ, হিসাবটিকে দেখা গেল

Masculine পেল 3 একক

Femine পেল 1 একক

অর্থাৎ, Femine Gender মোট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হল (3 – 1) একক = 2 একক। মহিলা শ্রেণির এই দ্বিগুণ পরিমাণ বঞ্চনার কারণেই মহিলাদের ভোগ করতে হয় দুঃখ, কষ্ট, অমর্যাদা ও অসন্তোষ। আর সেইসব সুযোগ-সুবিধা অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করে পুরুষ বা Masculine Gender আনন্দে, উচ্ছ্বাসে জীবন অতিবাহিত করে, নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নারী নির্যাতন ও নারী নিপীড়নে প্রয়াসী হয়। শিক্ষিত রুচিবান পুরুষ এই ক্ষমতার বলে নিজের আভিজাত্য আর মর্যাদাকে তুলে ধরে। চরিত্রহীন লম্পট পুরুষ সুরাপান করে, বাইজি নাচায় আর মাংসের স্বাদ গ্রহণ করে। আধুনিক যুগে পাড়ার মস্তান এই ক্ষমতার বলেই কোনো বাবা-মার সুন্দরী কন্যাকে নিজের কেনা সম্পত্তি বলে দাবি করে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। না পেলে মেয়েটিকে পাবার জন্য বাড়ির পরিবার পরিজনদের ওপর বসায় তার হিংসার ছোবল, অথবা মেয়েটির ওপর নেমে আসে হিংস্র পশুর মতো নখরযুক্ত থাবার আক্রমণ।

Gender Biasness-এর ফলকে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রগত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। **পারিবারিক ক্ষেত্রে :** পারিবারিক ক্ষেত্রে Masculine Gender-এর প্রতি Biasness দেখা যায় কতকগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করে যথা—

(ক) খাদ্যবণ্টনগত : অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় পরিবারে পুত্রসন্তানদেরই বেশি খাবার ও অপেক্ষাকৃত উন্নত গুণগত মানের খাবার দেওয়া হয়। অনেকসময় বোনদের বা দিদিদের অথবা মায়ের খাবারের অংশ থেকেও কিছুটা পরিমাণ নিয়ে দাদা, ভাই বা বাবাকে দেওয়া হয়। বাল্যকাল থেকে মেয়েদের ত্যাগের মানসিকতায় অভ্যস্থ করা হয়ে থাকে ও ত্যাগের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে Feminine Gender বঞ্চিতই হয়।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রগত : শিক্ষার ক্ষেত্রেও Biasness-এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বাবা-মা ও দাদু-দিদা জানেন পুত্র ও কন্যা সমান। তবুও পুত্র, নাতি প্রমুখের প্রতি অন্ধ স্নেহ তাদের বিশেষভাবে আসক্ত করে। তাই বাল্যকাল থেকেই পুত্রের পড়াশুনো, পুত্রের উন্নতি, পুত্রের বা নাতির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার যতটা আগ্রহী অধিকাংশ পরিবারই কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে ততটা আগ্রহ দেখায় না। অনেকেরই এমন একটা ভাব যে, কোনো রকমে কন্যাকে বিবাহযোগ্যা করে পাত্রস্থ করতে পারলেই দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বর্তমানে নগর বা শহরকেন্দ্রিক, শিল্পভিত্তিক সমাজে এ ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও গ্রামের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই এই মতাদর্শের অনুগামী।

(গ) চিকিৎসাগত : আমরা পরিবারে বাস করি। রোগ ও দুর্ঘটনা অনেক সময়েই আমাদের জীবনে ঘটে

থাকে। পুত্রসন্তানের সামান্যতম অসুবিধা হলেই আমরা তার চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অথচ কন্যাসন্তান অথবা স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে আমরা তত চিন্তা করি না। অনেক পরিবারেই মহিলারা বহু কষ্ট সহ্য করে রোগ চেপে থাকেন, চিকিৎসার জন্য খরচের ভয়ে প্রকাশ করেন না।

(ঘ) সাংসারিক কাজকর্ম : সাংসারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে পুত্রসন্তানের প্রতি চরম পক্ষপাত দুষ্টতা অধিকাংশ পরিবারের মধ্যে প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়। পুত্রসন্তানকে দিয়ে সাধারণত কোনো কাজ করানো হয় না। ফলে পড়াশোনা, বিনোদন, খেলাধূলা ইত্যাদিতে যথেষ্ট সময় পুত্রসন্তান পেয়ে থাকে। আবার শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না বলে পুত্রসন্তানের শারীরিক ক্লান্তিও কম থাকে। মানসিক দিক থেকেও পুত্রসন্তান অনেক বেশি আনন্দ ও আরাম ভোগ করে থাকে। কিন্তু কন্যাকে বাল্যকাল থেকেই সাংসারিক কাজের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়—এই বলে যে, 'এখন কাজ না শিখলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হবে।' এক্ষেত্রে মা, কাকিমা, ঠাকুমা, জেঠিমারাই হয়ে ওঠেন মেয়েদের শত্রু। কন্যাসন্তান কাজের জন্য পড়াশুনার সময়ও কম পায়। পরিশ্রমের ফলে শারীরিক ক্লান্তিও আসে। ফলে এক্ষেত্রেও নারী দ্বিগুণ পরিমাণেই বঞ্চিত হয়। এটাও Biasness-এর আরও একটি প্রভাব।

২। **সামাজিক ক্ষেত্রে** : সামাজিক ক্ষেত্রের দিক থেকে চিন্তা করলেও Biasness-এর একই ধরণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) কর্মক্ষেত্রগত বা কর্মগত : সমাজের অধিকাংশ বেসরকারী ক্ষেত্র বা মহিলা কর্মীদের যতটা পরিমাণ পরিশ্রম করানো হয় সে তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক পুরুষ কর্মীর তুলনায় কমই থাকে। বাড়িতে পরিচালিকাকে দিয়ে যতটা পরিশ্রম করানো হয় সেই একই পরিমাণ পরিশ্রম যদি কোনো পুরুষ কর্মীকে দিয়ে করানো হয় তবে সে মহিলা কর্মীর থেকে বেশি পারিশ্রমিকই দাবি করবে। অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে মহিলা কর্মীর কম পরিশ্রম পেয়ে থাকেন। এটা সামাজিক ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক আয় বৈষম্যজনিত এক ধরণের Biasness।

(খ) মর্যাদাগত : সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই মর্যাদার পুরুষ ও মহিলার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। উচ্চপদে কর্মরত মহিলা ও পুরুষ কর্মীর মর্যাদা ভোগ করার বিষয়টির তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় পুরুষ কর্মীই বেশি মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন নারী-গৃহবধূ হওয়ার কারণে অনেকসময় বংশমর্যাদা বা আভিজাত্যের গোঁড়মি দেখিয়ে তাকে কাজ করতে না দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। অথচ ঐ পরিবারের বা বংশের মেয়েদের ঐ ধরণের কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধাই দেওয়া হয় না।

(গ) সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি : সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো পালনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় Feminine Gender বা নারীকে কঠোর ও কঠিন নিয়মনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সে তুলনায় পুরুষের ঐ সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ অনেক বেশি শিথিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নারী দেবীমূর্তির পূজার মন্দিরে ওঠার অধিকার থেকে নারী অনেক সময়েই বঞ্চিতা। আবার উৎসব অনুষ্ঠানে, একাদশী, পূর্ণিমা ইত্যাদিতে নারীদেরই কষ্ট সহ্য করে উপবাসী থাকতে হয়। পুরুষ কিন্তু ওইসব অনুষ্ঠানে ভালোভালো খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করে আজও ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা মহিলাদের আমিষ খাবার একেবারেই নিষিদ্ধ কিন্তু বিপত্নীক পুরুষদের পাঁঠার মাংস ও অন্যান্য ভালো খাদ্যগ্রহণ অশাস্ত্রীয় নয়। এগুলোও Masculine Gender-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বেরই নিদর্শন।

(ঘ) সামাজিক কুপ্রথা : Female Sex কে Feminine Gender-এ পরিণত করার ক্ষেত্রে সতী, দেবদাসী ইত্যাদি প্রথাগুলি বিশেষভাবে দায়ী। সমাজে এইসব কুপ্রথার প্রভাব আজও চলে আসছে কিন্তু সৎ বা দেবদাসরূপ কোনো প্রথার অস্তিত্ব আজও সমাজে নেই। আবার ডাইনি সন্দেহে এখনও বহু নারীকে নির্বিচারে খুন করা হয় সম্মিলিতভাবে। গ্রাম্য প্রহসনমূলক সালিশি সভার আয়োজন করে দুঃশ্চরিত্রা অপবাদ দিয়ে বিবস্ত্র নারীকে গ্রামে ঘোরানো হয়। কোনো Masculine Gender-এর ওপর এইরূপ অত্যাচার করতে সচরাচর দেখা যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হয় যে লিঙ্গগত পক্ষপাত একপ্রকার সামাজিক ব্যাধি যার মূলে নিহিত আছে সমাজের প্রভাবশালী Masculine Gender-এর ক্ষমতা ও প্রভাব। ভারতবর্ষের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তাই Masculine Gender হিসেবে পুরুষই সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। Masculine Gender-এর প্রতি এই Biasness কে হ্রাস করতে হলে প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়েরই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শে ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার আদর্শে শিক্ষিত হয়ে ওঠা। গণতন্ত্র বলতে শুধুমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতিনির্ভর গণতন্ত্র নয়; এক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র অর্থাৎ যখন 'Democracy will be a way of life' হবে তখনই নারী পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য আসবে এবং তখনই পুরুষের প্রতি পক্ষপাত দুষ্টতা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হবে। এটা সময় সাপেক্ষ হলেও তা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন

৪। লিঙ্গগত অপরিবর্তনশীল (Gender Stereotype) মনোভাব বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর 'Stereotype' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল বাঁধাধরা বা অপরিবর্তনীয়তা। শব্দটির আরও একটি অর্থ হল কম্পোজ করা টাইপের ছাঁচে ঢালা ফলক। অর্থাৎ, Stereotype-এর অর্থ যে কোনো বিষয়ে এমন একটি ধারণা যা পরিবর্তিত হয় না বা যা পাল্টায় না। স্বাভাবিকভাবেই 'Gender Sterotype' শব্দ দুটির মাধ্যমে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যাতে লিঙ্গগত ক্ষেত্রে একই ধরণের অবস্থা আবহমানকাল ধরেই চলতে থাকে। অর্থাৎ, লিঙ্গগত ক্ষেত্রে যে অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই তাকেই বলা হয়ে থাকে 'Gender Stereotyping'। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে এই Stereotyping-এর অর্থ মাতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রাধান্যে আবহমানকালের স্বীকৃতি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজেও Stereotyping-এর অর্থ পুরুষের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগের আবহমানকালের স্বীকৃতি। বাস্তব অবস্থা হল এটাই যে অধিকাংশ সমাজই পিতৃতান্ত্রিক। ফলেই এই ধরণের সমাজব্যবস্থায় সব ধরণের দুঃখ আর কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে পুরুষশাসিত নারীসমাজকে।

Stereotype সম্বন্ধে R.A. Baron এবং D. Byrne বলেছেন 'Stereotypes are beliefs to the effect that all members of a specific social group share certain traits or characteristics, stereotypes are cognitive frame works that strongly infuluence the processing of incoming social information'. অর্থাৎ Stereotype হল কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে এমন এক বদ্ধমূল বিশ্বাস যে ওই গোষ্ঠীর সকলের মধ্যেই কিছু সাধারণ সংলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এটি এমন এক প্রজ্ঞামূলক কাঠামো যা প্রবলভাবে ওই গোষ্ঠী সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জাগরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে Gender Stereotyping সম্পর্কে যে ধরণের সাধারণ সংলক্ষণগুলো বা গুণগুলো বাল্যকাল থেকে বিকশিত হতে দেখা যায়।

সেগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে তুলে ধরা যেতে পারে—

পুরুষের ক্ষেত্রে যেসব গুণ পরিলক্ষিত হয় :

১) আত্মবিশ্বাস,
২) নেতৃত্ব পরায়ণতা,
৩) যুক্তিবাদীতা,
৪) উচ্চাকাঙ্খা,
৫) স্বাধীনচেতাভাব,
৬) প্রতিযোগীর মনোভাব,
৭) সাহসী,
৮) মানসিক দৃঢ়তা,

৯) পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ,

১০) আত্মসম্মান বোধের দৃঢ়তা এবং

১১) সততা ও সদাচারিতা।

এইসব গুণাবলীকেই পৌরুষ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে বলে এইসব গুণের অধিকারীদের বলা হ
পুরুষ। মহিলাদের ক্ষেত্রে যেসব গুণের বিকাশ ঘটতে দেখা যায় সেগুলো হল—

১) অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ/আবেগপ্রবণ,

২) দয়ালু,

৩) শিশুপ্রিয়,

৪) অল্প আঘাতেই ভেঙ্গে পড়া এবং কেঁদে ফেলা,

৫) গৃহকর্ম ও গৃহসজ্জায় আসক্ত,

৬) বিপদে হতাশ ও মানসিক ভারসাম্যে বিঘ্ন,

৭) সম্পর্ক স্থাপনে আন্তরিক,

৮) একত্রে সমবেদ হলে গল্পে অত্যন্ত বেশি আগ্রহী,

৯) অন্যের মতামতকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া,

১০) সাজসজ্জার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তি এবং

১১) গুরুজনদের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী বা শ্রদ্ধাবান।

Gender Stereotype বলতে লিঙ্গগত অচলাবস্থাকে বোঝায় যা সামাজিক অচলাবস্থা বা Ssocial St
reotype-এরই ফল। অচলাবস্থা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করতে গেলেই Status বা মর্যাদা সম্পর্কি
বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। Status বা মর্যাদা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা— (i) Ascribed Statu
বা প্রাপ্ত মর্যাদা এবং (ii) Achieved Status বা অর্জিত মর্যাদা। Ascribed Status বা প্রাপ্ত মর্যাদা এবং (i
Achieved Status বা অর্জিত মর্যাদা। Ascribed Status বা প্রাপ্ত মর্যাদা জন্মের ভিত্তিতেই ব্যক্তি লাভ ক
থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জন্মের পর থেকেই পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে পুত্রসন্তানেরা যে ধনাত্ম
ধরণের মর্যাদা লাভ করে তা তার প্রাপ্ত মর্যাদা। কিন্তু কন্যাসন্তানেরা এই সমাজেই জন্মের পর থেকে যে মর্যাদ
লাভ করে তা ঋণাত্মক চরিত্রসম্পন্ন। কারণ মর্যাদাগত দিক থেকে জন্মের পর থেকেই কন্যাসন্তানের ব্যক্তিত্বে
অবমূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে। এই ধরণের মর্যাদা তার ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন তো ঘটায়ই না; বরং তা তার স্বাধীনত
ও অধিকারকে সঙ্কুচিত করে। এ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্ Kingsley Devis-এর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি
বলেছেন—পাশ্চাত্য সমাজে এমন একটা সময় ছিল যখন দীর্ঘকাল ধরে নারীদের মনে করা হতো 'Stupid
delicate, emotional, intuitive, religious' অর্থাৎ নির্বোধ, দুর্বল, আবেগপ্রবণ, স্বজ্ঞাত ও ধর্মপ্রবণ। এ
কারণেই পাশ্চাত্য সমাজে নারীরা সুযোগসুবিধা পেতেন না এবং স্ত্রী ও পুরুষের আচরণের নৈতিক মানেরও
ভিন্নতা ছিল। বর্তমান সমাজেও নারীর Ascribed Status বা প্রাপ্ত মর্যাদা যে খুব উন্নত হয়েছে তা বলা যাবে
না। এ প্রসঙ্গে এস ওয়াজেদ আলির ছোটগল্প 'ভারতবর্ষ'-এর সেই বিখ্যাত পংক্তিটি—'সেই ট্র্যাডিশন সমানে
চলছে'—খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়। Gender-গত দিকের এই Stereotyping বা অচলায়তনই নারী সমাজের
দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। এই অচলায়তন নারী সমাজকে ভাঙ্গতেই হবে এবং তা করতে হবে তার
Achieved Status বা অর্জিত মর্যাদার মধ্য দিয়ে। পুত্রসন্তানদের Ascribed Status বা প্রাপ্ত মর্যাদা তাদের
ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে Positive Reinforcement বা ধনাত্মক অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। তাই তাদের Achieved
Status সামান্য হলেও তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা সম্মান অর্জিত হয় বেশি। ভারতীয় নারীদের পক্ষে এ
সমাজে Ascribed Status বা প্রাপ্ত মর্যাদা অর্জন করা খুবই কষ্টকর, কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভারতীয়
নারীদের সে সুযোগ দিতে চাইবে বলে মনে হয় না। তাই সামাজিক ও লিঙ্গগত অচলায়তনকে অতিক্রম করে
নিজের মর্যাদাকে উন্নত করতে হলে প্রাপ্ত মর্যাদার ঋণাত্মক দিকের বোঝাকে অতিক্রম করে অর্জিত মর্যাদাই

নারীদের অর্জন করতে হবে। সে কারণে পুরুষের থেকেও দ্বিগুণ পরিমাণ মর্যাদা তাকে অর্জন করতে হবে। এইভাবে Achieved Status অর্জনের মধ্য দিয়েই Social Mobility বা সামাজিক সচলতার মাধ্যমে ভারতীয় নারী Social Stereotype কে ভেঙে দিয়ে, Gender Stereotype-এর গণ্ডিকে অতিক্রম করে Social, Economic ও Political ক্ষেত্রের মর্যাদাকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে পারবে; যার একমাত্র ও অন্যতম উপায় হল যথাযথ শিক্ষা অর্জন।

প্রশ্ন ৫ **ক্ষমতায়ণ (Empowerment) কি ? ক্ষমতায়ণ কিভাবে মানবী থেকে নারীকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করে ?**

উত্তর 'Empowerment' শব্দটি মূল ইংরেজি শব্দ 'Power' থেকে এসেছে। শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণা। কোনো ব্যক্তি যদি যে কোনো উপায়ে অপর কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারে তখনই ক্ষমতার ধারণা আসে। অর্থাৎ তখনই ওই ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তবে ক্ষমতার ধারণার সাথে আরও একটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই ধারণাটি হল কর্তৃত্ব বা Authority-র ধারণা। যিনি কোনো বিষয়ে ক্ষমতা ভোগ করেন তার কর্তৃত্ব বা Authority-র ধারণা। যিনি কোনো বিষয়ে ক্ষমতা ভোগ করেন তার কর্তৃত্ব বা authority আছে বলেই ধরে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ Machiavelli তাঁর 'Prince' ও 'Discourses' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কীভাবে ক্ষমতা অর্জন করা যাবে এবং অর্জিত ক্ষমতাকে কীভাবে বজায় রাখা যাবে। Hans Morgenthau তাঁর 'Power, who gets when and How' গ্রন্থেও ক্ষমতা অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ধারণা হলেও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার ও প্রয়োগ প্রত্যক্ষভাবেই প্রমাণিত হয়। সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী বা প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণিই বেশি ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। তবে ক্ষমতা ভোগ করার ক্ষেত্রে সর্বদা একই ধরণের নীতি গৃহীত হয় না। তাই ক্ষমতাও বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে যেসব ক্ষমতার কথা আলোচনা করা যেতে পারে সেগুলো হল—

(i) Legitimate Power বা আইনগত কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা : কোনো সমাজে যে ব্যক্তি বা যে শ্রেণি আইনগতভাবে ক্ষমতা ভোগের অধিকার লাভ করেছে সেই ব্যক্তি বা সেই শ্রেণির আইনগত কর্তৃত্বকেও সকলে মেনে নিয়েছে। এই ধরণের Power-কেই বলা হয়ে থাকে Legitimate Power, যেমন সরকারীর কোনো আমলার ক্ষমতা আইনগতভাবে স্বীকৃত বলে সকলেই তাকে মেনে চলে।

(ii) Induced Power : 'Induce' শব্দের অর্থ প্রভাব খাটানো বা রাজি করানো। অনেকসময় আবার কোনো দ্রব্য, উপহার বা অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও অনেককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হতে পারে। এই ধরণের ক্ষমতারও যথেষ্ট প্রভাব আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চকোলেটের লোভ দেখিয়ে শিশু ও কিশোরদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া, অর্থের লোভ দেখিয়ে কর্মীকে দিয়ে Overtime খাটিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়া ইত্যাদি।

(iii) Coersive Power বা বল প্রয়োগমূলক ক্ষমতা : এই ধরণের ক্ষমতার ধারণায় চরম ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ক্ষমতার জোরে জোর করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসীর ওপর বৃটিশের অত্যাচারমূলক কাজকর্মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(iv) Charismatic Power : 'Charismatic' শব্দের অর্থ হল সহজাত বা দক্ষতাসম্পন্ন। এই ধরণের ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন সেই ব্যক্তি যার সহজাত বিশেষ কতকগুলি গুণ আছে। এই গুণের জন্যই সমাজের মানুষজন ভালোবেসে তার কাজ করে দেয়।

উপরিউক্ত চার ধরণের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হলেও আমরা ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে যে প্রসঙ্গে আসতে চাই তা ভিন্ন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু সমাজব্যবস্থার

চরিত্রের সাথেও তা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বর্তমানে অধিকাংশ সমাজই পুরুষশাসিত সমাজ। অর্থাৎ, এইসব সমাজে পুরুষই (Male Gender) ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। পুরুষই নিজ স্বার্থে আইনকানুন রচনা করে, রীতিনীতি তৈরি করে। এই বিষয়ে নারী সমাজ বা Feminine Genddr-এর মতামতকে কোনো গুরুত্ব বা স্বীকৃতি দেয় না। এই দিক থেকে বিচার করে আমরা পুরুষশাসিত সমাজের ক্ষমতায়নকে Coersive Power বলেই ধরতে পারি। কারণ প্রাচীন যুগ থেকেই পুরুষ নিজ স্বার্থে আইনকানুন তৈরি করেছে। এই বিষয়ে নারীর মর্যাদা বা অধিকারকে কোনো গুরুত্বই সে দেয়নি। পুরুষ বা Masculine Gender-এর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি বা স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারে নি। সুতরাং, যে ক্ষমতা সে ভোগ করে সে ক্ষমতা অপর শ্রেণিকে বঞ্চিত করে, উপরকে ভুল বুঝিয়ে, অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভোগ করা ক্ষমতা। তাই সেই ক্ষমতা কখনোই Legitimite নয়। আবার সেই ক্ষমতা ভোগ করতে গিয়ে সে যেহেতু বিপরীত শ্রেণিকে আনন্দ বা মানসিক সন্তুষ্টি দিতে পারে না তাই সে ক্ষমতা Induced Power-ও নয়। এই Power Charismatic Power-ও নয়, কারণ পুরুষ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে সেই গুণের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে নারী তাকে মেনে চলে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়— এই ক্ষমতা Coersive Power বা বলপ্রয়োগমূলক ক্ষমতা। কারণ এই ক্ষমতার বলেই পুরুষ মহিলাকে দমিয়ে রাখে, তার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং তাকে সর্বদা নিজের কাজে ব্যবহার করে।

বাল্যকাল থেকেই Gender গত মানসিকতা Construction বা নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। Male Child তার বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে যেসব Outdoor খেলাধূলো করে থাকে, সে সব খেলাধূলায় সে শক্তি প্রদর্শনের কাজে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। তাই শেষ পর্যন্ত তাদের dominant attitude গড়ে ওঠে। অন্যদিকে কন্যাসন্তান পুতুলখেলা ও অন্যান্য Indoor Game-এ অভ্যস্থ হতে থাকে এবং গৃহস্থালির বিভিন্ন কার্যসম্পাদন ও তার নমনীয় জৈবিক সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেকে Dominated বা Oppressed মানসিকতার অধিকারী করেই গড়ে তুলতে থাকে। অর্থাৎ Male Gender ও Female Gender উভয়ের life orientation টাই হয়ে ওঠে পৃথক পৃথক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে। এই ধরণের সামাজিক নির্মাণের পিছনে আমাদের সমাজের সকল প্রভাবও কম নয়। আমরা ইচ্ছে করেই তাদের এভাবে বড় হতে দিই। তাই ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতাও এইভাবেই গড়ে উঠতে থাকে। Male Sex বা পুরুষ ক্ষমতা ও প্রভাব ভোগ করে Masculine Gender-এ পরিণত হয়। মহিলা বা নারী সব ক্ষমতা, প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারিয়ে এবং Masculine Gender-এর প্রভাবকে মেনে নিয়ে Feminine Gender-এ পরিণত হয়।

প্রশ্ন

৬। নারী সমাজের ক্ষমতাহীনতার কারণগুলি আলোচনা করো।

উত্তর Erik Erickson তাঁর বিখ্যাত 'Psychosocial Development' তত্ত্বে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশকে তিনি মানসিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির আচরণের রূপরেখার উন্নয়নে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জিনগতভাবেই তা নির্ধারিত। বাল্যকালে শিশুদের মধ্যে আত্মসচেতন আবেগসমূহ স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের প্রভাব ছাড়াই বিকশিত হয়। অভিভাবক অভিভাবিকারা বাচ্চার ওপর কোনো নেতিবাচক আবেগের প্রভাব (যেমন—রাগ দেখানো, অপমান করা) না দেখালে বাচ্চারা নিজেদের অত্যন্ত সুখীবোধ করে। প্রশংসা বা খাতির করা হলে তারা ইতিবাচক প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করলে তারা মনে করতে থাকে যে তারা অপদার্থ ও মূল্যহীন এবং তারা তাদের কাঙ্খিত কোনো কাজই করতে পারবে না। ফলে তারা ক্রমশই লাজুক ও ভীতু প্রকৃতির হয়ে উঠতে থাকে। Erickson তাঁর তত্ত্বের 'Autonomous Vs Shame and doubt' অংশে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। পারিবারিক ও সমাজ পরিবেশের প্রভাবেই কিশোরীরা দ্বিতীয় ধরণের প্রভাবেই প্রভাবিত হয়। আবার এই